বিষ্ণুপ্রিয়া ঃ জীবন ও সাধনা

মালা মৈত্র

জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০

প্রকাশক ঃ দিলীপ চক্রবর্তী
জে এন চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম রায়

মুদ্রণ ঃ গোপাল চন্দ্র পাল
স্টার প্রিন্টিং প্রেস
২১/ এ, রাধানাথ বোস লেন
কলিকাতা - ৭০০ ০০৬

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্ম পঞ্চশত বর্ষ পূর্তিতে

শ্রীসাধন চন্দ্র মণ্ডল, আই. পি. এস.

ও

শ্রী মোহিত রায়

এর

করকমলে—

সূচী

প্রচ্ছদপট পরিচিতি ঃ

ধামেশ্বরী বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহের ছবি

পরিচায়িকা

কৃষ্ণাবতার-রূপে লোক-পূজিত শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় পরিণীতা অথচ পরিত্যক্তা পত্নী হিসাবেই যে বিষ্ণুপ্রিয়ার খ্যাতি তা আংশিকভাবে সঠিক হলেও পূর্ণ সত্য নয়। হরিনাম সাধিকা ও প্রকৃত সন্ন্যাসিনী হিসাবেও তাঁর স্থান বাঙালীর বৈষ্ণবসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই নিয়ে চৈতন্য-সমকালীন পদকর্তাদের পদে, চৈতন্য-তিরোধানের পরবর্তী বিখ্যাত জীবনীকারদের গ্রন্থে এবং বিশেষে আরও পরবর্তী কয়েকটি চরিতকথায় ও গীতে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাবজীবনের চিত্র গ্রথিত দেখা যায়। এই পরবর্তী গ্রন্থগুলির প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত না হলেও যে-সব জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে লেখা হয়েছিল তার সত্যতা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য এমনও নয়। শ্রীমতী মালা মৈত্র এম.এ., বি. টি. ঐ সব জীবনীগ্রন্থ ও পদরচনা সমাহরণ ও সমীকৃত করে এই 'বিষ্ণুপ্রিয়া ঃ জীবন ও সাধনা' পুস্তিকাটি সাম্প্রতিক ভক্তজনকে উপহার দিয়েছেন।

নানা কারণে শ্রীচৈতন্য-প্রদর্শিত ও তখনকার সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও ভক্তবর্গ কর্তৃক আচরিত ও প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব নব-ভক্তিধর্ম আঠারো শতাব্দীর কিছুকাল পর থেকেই ক্রম-অবক্ষয়ের পথে গেছে। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও বাহুতে ও নাসিকা-কপালে চন্দনচর্চিত বৈষ্ণবদের সাক্ষাত পাওয়া যেত, কিছু কাল আগেও কীর্তনিয়া সম্প্রদায়গুলিকে গ্রাম ও নগর রসসিক্ত করে রাখতে দেখা যেত, কিন্তু এখন তা বিরল হয়ে পড়েছে অথবা একটা ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে বললেই চলে। নামকেন্দ্রিক সহজ ভক্তিধর্ম থেকে উৎসারিত অথচ স্বল্প-পরিবর্তিত বাউল-সম্প্রদায়ও অনিবার্য বিলয়ের মুখে, যা নিয়ে বর্তমানে লোক-সাহিত্যিক গবেষণা চলছে। ভালো হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে সে বিচার নিরর্থক, কালক্রমে হয়তো তা-ই ঘটছে। তবু ষোড়শ শতাব্দীর ধারার স্বল্প পরের জীবনীগ্রন্থে চিত্রিত শ্রীচৈতন্য-জীবনের সঙ্গে প্রতিমূর্ত এই ভক্তিধর্ম-আন্দোলন তখনকার মানুষগুলির সাংস্কৃতিক জীবনের যে পরিচয় আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করে তা ছবির মতো স্মৃতিপটে দেখা দিয়ে সেকালের জন্য একটা বেদনাবোধ মনে জাগিয়েই রাখে।

শ্রীমতী মালার সংগৃহীত বহু উপকরণে সমৃদ্ধ 'বিষ্ণুপ্রিয়াঃ জীবন ও সাধনা' বইটি পড়তে পড়তে সেকালের বেদনাময় স্মৃতির একটি অধ্যায় মনে ভেসে উঠল এবং একালের দলনীতির কোলাহল ও জীবন-সংগ্রামের বাস্তবতা থেকে সাময়িকভাবেও মুক্তি পাওয়া গেল। এ জন্য প্রাথমিকভাবে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। গৌরাঙ্গ পরিত্যক্তা মাতা ও পত্নীর শোকাহত সংসারজীবন, বিষ্ণুপ্রিয়ার তপস্যা ও তাঁদের সঙ্গী সাথী সহ নবদ্বীপের একটি স্মরণীয় প্রান্তকে তিনি উজ্জ্বলভাবে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। ঠিক ঐতিহাসিকের শুষ্ক গবেষণামূলক দৃষ্টিতে নয়, ভক্ত চিত্রকরের দৃষ্টিতে। এর প্রয়োজনও ছিল, কারণ, দলাদলি ও স্বার্থসংঘাতে সব মানুষই তো আর সংজ্ঞাহারা

হয়ে পড়েন নি। তবে ইতিবৃত্তের একটা কথা এ প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে স্মরণীয় হয়ে ওঠে আমাদের মতো আলোচকের পক্ষে। সেটা এই যে, সঠিক ইতিবৃত্তের দিকে গেলে দেখতেন যে শ্রীচৈতন্য দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করতে কোনোমতেই চাননি। বিশ্বরূপ ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে সন্ত্রস্ত শচীমাতা—বিশ্বম্ভর যেন সংসারী হয়—এই মনোভাবের তাড়নায় নিজে জোর করে এই দ্বিতীয় সম্বন্ধ স্থির করেন। আর বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যর কোনো অনুরাগ-সম্পর্কও গড়ে ওঠেনি। সে যাই হোক, লেখিকার সমাহরণ নৈপুন্য এবং প্রাপ্ত উপাদানগুলির সমপ্রসীকরণের শক্তি অবশ্য স্বীকার্য, আর সেই সঙ্গে প্রশংসা করতে হয় তাঁর আন্তরিকতার। তাঁর লেখনী যেমন সরস ও সরল, তেমনি সাহিত্যিক আবেগ-মণ্ডিত। তাঁর গ্রন্থ শেষের দিকে সংযোজিত বিষ্ণুপ্রিয়ার সহস্রনাম কীর্তন প্রভৃতি উপাদান-যোজনাগুলিকে বাদ দিয়েই তাঁর লেখনী সম্পর্কে উচ্চ ধারণার বিষয় জানাচ্ছি। তাঁর স্বকীয় সাহিত্যিক পরিবেশনার পথেই আমি তাঁর অগ্রগতি কামনা করি ও সরলমনা সামাজিক মানুষের চিত্তকে ক্রমে ক্রমে অধিকতর ভাবপ্রেরনায় উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানাই।

ইতি —

শ্রীদেবব্রত [illegible]

প্রাক্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পূর্বাভাস

চৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলা এক কথায় বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে ভরপুর। এখানেই যেমন তাঁর জীবনের উচ্ছলতা—উদ্দামতার শুরু ও পাণ্ডিত্যের চরম বিকাশ ঘটতে দেখি, তেমনি গয়া থেকে ফিরে এসে কিছুদিনের মধ্যেই সন্ন্যাস গ্রহণান্তে একান্ত পুণ্যব্রতা পতিব্রতা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে নির্মম প্রত্যাখানে তা কঠিন হৃদয় বিদারক দৃশ্য হিসেবে চির পরিচিত। স্পষ্টতই দেখা যায় সন্ন্যাস গ্রহণান্তে চৈতন্য জীবনের নবদ্বীপলীলার অবসান ঘটল এবং তিনি সন্ন্যাসোত্তর জীবন যাপনের জন্য নীলাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। স্বাভাবিকভাবেই সন্ন্যাসের সাধারণ ধর্ম অনুসারেই নবদ্বীপে পরিত্যক্ত হলেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। চৈতন্যদেবের বিবাহিত স্ত্রী হিসেবে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-গ্রহণ পরবর্তী অধ্যায়ে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে যে একক সাধিকার জীবন যাপন করতে হয়েছে সুদীর্ঘকাল, তারই পটভূমি সৃষ্টি হলচৈতন্যদেবেরসন্ন্যাস গ্রহণ ও নবদ্বীপলীলার অবসানে। যেমন—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপিণী বলে উল্লেখকরাহয়েছে। ভক্তগণ তাঁকে 'ভূ-শক্তি' বলে জানেন। বস্তুতঃ তিনি হ্লাদিনী সারসমবেত সম্বিত-শক্তি অর্থাৎ ভক্তি স্বরূপিণী—গৌরাবতারে নামপ্রচারের সহায় স্বরূপে উদিতা হয়েছিলেন। নবদ্বীপধাম যেমন নববিধাভক্তির স্বরূপ ন'টি দ্বীপ, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও তেমন নবধা-শক্তির স্বরূপ। এ প্রসঙ্গে প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করা যাবে। এবার আসা যাক গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার অবতার হিসেবে আবির্ভাব প্রসঙ্গে।

অবতার অর্থ অবতরণ, অর্থাৎ নেমে আসা। তিনি যে জীবের দুঃখে কাতর ভগবানের অবতার তার প্রধান সাক্ষী—জীবন্ত প্রমাণ। শাস্ত্রে বলা হয়ে থাকে যে, দুষ্টের দমন ও অসুর বিনাশ করা অবতারের উদ্দেশ্য। কিন্তু যাঁর ইঙ্গিতে সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়, তিনি দুই একটি অসুর নিধনের জন্য অবতীর্ণ হবেন কেন? এটি তাঁর বহিরঙ্গ বা আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য। তিনি যে জীবকে ভালবাসেন, জীব যে তাঁর অতি নিজ জন, এটি জীবকে বোঝাতেই তিনি অবতীর্ণ হন। কিভাবে জীবকে ভালবাসতে হয়, তা দেখাতে এবং তাদের ভালবাসা গ্রহণ করতে তিনি জীব সমাজে আসেন। জীবে জীবে এবং জীবে ভগবানে ভালবাসা সংস্থাপন করে জগৎকে সুখময়

করা তাঁর অবতারের মূল উদ্দেশ্য। ভগবান জীব চরিত্র জানেন। তিনিই তো জীব-প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন। জীবকে কিভাবে আকর্ষণ করতে হয় তাও তিনি বোঝেন। স্বীয় হ্লাদিনী শক্তি সহকারে তিনি অবতীর্ণ হন। যুগে যুগে এই লীলা প্রকটিত হচ্ছে। ত্রেতায় রামসীতা, দ্বাপরে কৃষ্ণরাধা এবং কলিতে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া রূপে তিনি আবির্ভূত হলেন। আবির্ভূত হয়ে বিরহলীলা করলেন যাতে জীবের হৃদয় দ্রবীভূত হয়। গৌরলীলার কথাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। বর্তমান যুগে গৌরলীলার এই বিরহলীলার নূতন তরঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। 'কলির জীব আরও কঠিন। অতিশয় মলিন। তাহাদের মলিন চিত্ত শোধনের নিমিত্ত এবার যে তিনি বিরহ-লীলা করিলেন ইহা আরো অসহনীয়। ইহা শুনিলে প্রাণ বাহিরিয়া যাইতে চায়। শ্রীরাধার বরং সান্ত্বনা ছিল যে কৃষ্ণ মথুরার রাজা। সেখানে তিনি দাসদাসী পরিবৃত্ত হইয়া পরম সুখে আছেন। যাঁহাকে ভালবাসা যায়, তিনি যদি সুখে থাকেন, তবে তাহাতেই সুখ হয়। তাঁহার সহিত মিলন না হইলেও তিনি সুখে আছেন এই সংবাদে প্রাণে সান্ত্বনা পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহে আছেন। আর তাঁহার প্রাণের পরম আরাধ্য বস্তু পরম প্রিয় সমগ্রী শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র বৃক্ষতলাবাসী কন্থাকরঙ্কধারী সন্ন্যাসী, তিনি পাতায় আহার করেন, ভূমিতে শয়ন করেন। কাঙ্গাল বেশে জীবের দুয়ারে দুয়ারে যাইয়া হরিনাম বিতরণ করেন। এ দুঃখ সহিবার নয়। তারপর শ্রীরাধার আর একটী সান্ত্বনা ছিল। কৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন, তিনি কাল আসিবেন। প্রত্যহই শ্রীরাধা অপেক্ষা করিতেন, কৃষ্ণ কাল আসিবেন। এই আশায় তিনি সঞ্জীবিত থাকিতেন। আর শ্রীরাধা ইহাও মনে করিতে পারিতেন, কৃষ্ণ তো চিরকালই পরপুরুষ, তাঁহার উপর তাঁহার আর কি অধিকার আছে। যে ক'দিন তিনি তাঁহাকে পাইয়াছেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে মহালাভ। এখন তিনি পর হইয়া পরই হইয়া আছেন, সুতরাং তাঁহার আর ইহাতে বলিবার কি আছে? কিন্তু শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার পক্ষে কি হইল? না,—শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার আপন হইয়া পর হইলেন। প্রভু যখন সন্ন্যাস করিয়া শান্তিপুর আসিলেন, তখন নিতাইকে তিনি বলিলেন, "যাও, নিতাই, নবদ্বীপে সংবাদ দেও।" নিতাই বলিলেন, "সকলকেই সংবাদ দিব? সকলকেই নিয়া আসিবে?" প্রভু বলিলেন, "একজন ছাড়া" অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া ছাড়া। প্রভুর আগমন সংবাদ পাইয়া নদীয়াবাসী সকলে "হরি বোল" ধ্বনি করিয়া গঙ্গা পার হইয়া চলিলেন। শ্রীশচীদেবী পাল্কিতে

ছাড়িয়া গেলেন। রহিলেন কেবলমাত্র বিষ্ণুপ্রিয়া। তাহারই প্রাণবল্লভকে সকলে পাইল। সকলে তাঁহার দর্শন সুখ পাইয়া নয়ন তৃপ্ত করিলেন। পাইলেন না কেবল বিষ্ণুপ্রিয়া। তিনি যেন জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কাঙ্গালিনী। তাঁহার প্রাণবল্লভ, জীবের লাগিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। তিনি আর গৃহে আসিবেন না। বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত আর মিলিত হইবেন না। এবার যে তিনি বিরহ লীলায় করুণ রস উঠাইলেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিরহ লীলার সহিত ইহার তুলনাই হইতে পারে না।......কঠিন জীবকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্তই শ্রীভগবান যুগে যুগে স্বীয় হ্লাদিনী শক্তির সহিত এইরূপ বিরহলীলার অবতারণা করেন।" [নদীয়া যুগল ভজন—শ্রীবিধুভূষণ সরকার]

এভাবেই সমাপ্ত হল চৈতন্য দেবের নবদ্বীপলীলার। সঙ্গে সঙ্গে সূত্রপাত হল বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সাধিকা জীবনের। নিমাই পণ্ডিতের সাধারণ গৃহবধূর জীবন থেকে দূরে সরে প্রকৃত চৈতন্যদেবের অনুগতা স্ত্রী হিসেবে সাধিকা জীবনে ঘটল উত্তরণ। এই পর্যায়ে নবদ্বীপে স্বামীর অবর্তমানে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী জীবন কাটিয়েছেন সম্পূর্ণ অবহেলিত অবস্থায়। কৃচ্ছ্রসাধন ও ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠায় বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর হৃদয়ে ব্যক্তি চৈতন্য স্বামীর আসন থেকে উঠে এসেছেন শাশ্বত চৈতন্যদেব হয়ে। চৈতন্যানুগত্যে একদিকে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী প্রেমভক্তি নিবেদন করেছেন স্বামীর চরণে। অন্যদিকে স্বামীর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্মাদর্শই তাঁকে প্রচারক ও প্রসারকের ভূমিকায় আলোকিত ও অবতীর্ণ করেছে। তাঁর এই গৃহকোণে থেকে নীরব অঙ্গুলিহেলনে নবদ্বীপের ও গৌড়ের বৈষ্ণব সমাজকে করায়ত্ত করা ও সামাল দেওয়া ধর্ম্মের প্রতি নিগূঢ় নিষ্ঠা, পরাকাষ্ঠা ও সুদৃঢ় আস্থার ফলেই সম্ভব হয়েছিল। প্রসঙ্গান্তরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর গুরুত্ব বৈষ্ণব ধর্ম সংগঠকদের কাছে কতখানি অপরিহার্য ছিল তার উদাহরণ পাওয়া যায় এখানেই—"শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের পর—শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য, খড়দহে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকার ঠাকুর ও উত্তরবঙ্গে রাজশাহীতে নরোত্তম দাস ঠাকুর বৈষ্ণব সাংগঠনিক ভূমিকায় ছিলেন। শ্রীবাসও চলে যান কুমারহট্টে (বর্ত্তমানে হালিশহরে)। নবদ্বীপে শচীমাতার কাছে গৌরাঙ্গপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী থাকতেন। বৈষ্ণবগণ যাতায়াতের পথে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে দর্শন করে যেতেন।" [ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ও নবদ্বীপের রাস উৎসব—ডঃ বংশীধর মোদক]

'গৌরাঙ্গপ্রিয়া' উপন্যাসের প্রাক্-কথনে শ্রী শশীভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন,

"গৌরাঙ্গলীলায় বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর একটি বিশেষ স্থান আছে। সে স্থানটির কথা সম্বন্ধে আমরা সব সময় খুব সচেতন নহি। বিষ্ণুপ্রিয়া নিজেকে চিরদিনই খানিকটা পটের আড়ালে রাখিয়াছেন, কিন্তু সেখান হইতে তিনি যে স্নিগ্ধ মধুর কিরণ বিকীর্ণ করিতেছেন তাহাকে লক্ষ্য করিতে না পারিলে বিচিত্র মধুর গৌরলীলাকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করাই হইল না।"

চৈতন্যদেব প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়েও 'আপনি আচরি ধর্ম' এই পথেই সকলকে প্রেমভাবে উদ্দীপিত করেছিলেন। অবশ্য তাঁর প্রবর্তিত এই বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলনকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে তিনি উপযুক্ত অনুগামী নির্বাচন করে তাঁদের বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়েছিলেন। এই পরিকরদের আশ্রয়েই যেমন শ্রীচৈতন্য ধর্মমত অসাধারণ সাফল্যলাভ করেছিল তেমনি চৈতন্যঘরণী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কঠোর সাধনায় গৌরতত্ত্ব সুনির্দিষ্ট রূপ পেয়েছিল। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের ফলে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পরিত্যক্তা স্ত্রী বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও যথার্থভাবেই চৈতন্যহীন নবদ্বীপে তিনি মূর্তিমতী সাধনার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর এই সাধনার ফলেই চৈতন্য-হীন নবদ্বীপ গৌরগম্ভীরা বা মহাগম্ভীরা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। এবং এই ক্ষেত্রেও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বেশ কয়েকজন পরিকর তাঁকে তাঁর সাধনায় বিশেষ শক্তি যুগিয়েছিলেন। এই পরিকরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন তাঁর অষ্ট সখী কাঞ্চনা, অমিতাদি এবং সেবক বংশীবদন, ঈষাণ, দামোদর পণ্ডিত, ভ্রাতা যাদবাচার্য্য, এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মাধবাচার্য্য প্রমুখ। প্রেমোন্মাদ দশায় চৈতন্যদেব পরিকরগণসহ প্রচার করেছেন কৃষ্ণকথার। সেখানে ওই প্রেমোন্মাদ দশাতেই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁর পরিকরগণসহ প্রচার করেছেন গৌরকথার। বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করার ইচ্ছা রইল।

বিষ্ণুপ্রিয়া : জীবন ও সাধনা

৯০০ বঙ্গাব্দের মাঘমাসের শুভ শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে নবদ্বীপের বৈদিক ব্রাহ্মণ, পরম বিষ্ণুভক্ত রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রর গৃহ ও পত্নী মহামায়ার কোল আলোকিত করে সুলক্ষণা কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া জন্মগ্রহণ করেন। হরিদাস গোস্বামীর বর্ণনায় :

সনাতন গৃহ আলোকিত করে।
মহামায়া গর্ব্ভে কে জনমিল রে॥
গোলোক ছাড়িয়া এসেছে গৌরাঙ্গ।
তাই বুঝি লক্ষ্মী আসিলেন সঙ্গ॥

[বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত]

নবদ্বীপবালা বিষ্ণুপ্রিয়া দেখতে কেমন হয়েছিলেন তা জানা যায় লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলে—

বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গ-জিনি লাখবাণ-সোনা।
ঝলমল করে যেন তড়িৎ প্রতিমা॥ ৪৩৫॥

বিষ্ণুপ্রিয়ার আবির্ভাব প্রসঙ্গ "নবদ্বীপ দীপশিখা বিষ্ণুপ্রিয়া" গ্রন্থে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে :

"মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথি। নবদ্বীপের ঘরে ঘরে, প্রতি টোলে টোলে সেদিন দেবী সরস্বতীর পূজার আয়োজন চলছে। বিদ্যাদায়িনী দেবী সরস্বতীর আরাধনা। টোলের পণ্ডিতরা ভক্তিনত প্রাণে একান্তভাবে দেবীর ধ্যানে মগ্ন।

সহসা সমস্ত শহরে কেমন করে রটে গেল রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের প্রাসাদে দেবীর আবির্ভাব হয়েছে। ভক্তের আকুল প্রার্থনায় দেবী সরস্বতী সনাতন মিশ্রের কন্যারূপে আবির্ভূতা হয়েছেন। দলে দলে শহরের লোক ছুটে চলল দেবীর দর্শন আকাঙ্ক্ষায়; পণ্ডিতেরা স্তব করতে লাগলেন দেবীর।

কৃতার্থ হয়ে গেলেন রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্র এবং পত্নী মহামায়া দেবী। ভক্তিনত প্রাণে তাঁরা বিষ্ণুর চরণে নিবেদন করে দিলেন কন্যাকে। ছোট্ট শিশুটি জন্ম মুহূর্তেই সমর্পিতা হয়ে গেল বিষ্ণুর চরণে। শিশু দিনে দিনে চন্দ্রকলার মত বড় হয়ে উঠতে লাগল।"

নবদ্বীপ নন্দন গৌর সুন্দরের বয়স তখন মাত্র আট। শিশুর চাপল্য নিয়ে সে সময় সে সমগ্র নবদ্বীপবাসীর নয়নের মণি ও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। অন্যদিকে একইরূপে দৃষ্টি সদ্যোজাত অপূর্ব সুন্দরী শিশু গৌরাঙ্গী বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকেও। ক্রমে বিষ্ণুপ্রিয়া শিশু প্রকৃতি কাটিয়ে বালিকা হলেন। এই বালিকা বয়সেই বিষ্ণুপ্রিয়া দীন-দুঃখীদের প্রতি পরম দয়াশীলা। সকলের কাছেই বিষ্ণুপ্রিয়া স্নেহময়ী, দয়াময়ী।

বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা সনাতন মিশ্রর ঘরে যেন একই সঙ্গে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী বাঁধা রয়েছেন। ধনী, বিদ্বান ও পরম বিষ্ণুভক্ত সনাতন মিশ্র সম্পর্কে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে বলা হয়েছে—

সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা-ভাগ্যবান।
দয়াশীল-স্বভাব—শ্রী সনাতন নাম ॥ ৪০ ॥
অকৈতব, উদার, পরম-বিষ্ণুভক্ত।
অতিথি সেবনে, পর-উপকারে রত ॥ ৪১ ॥
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মহা-বংশ-জাত।
পদবী 'রাজ-পণ্ডিত', সর্ব্বত্র বিখ্যাত ॥ ৪২ ॥
ব্যবহারেও পরম সম্পন্ন একজন।
অনায়াসে অনেকেরে করে পোষণ ॥ ৪৩ ॥

বিষ্ণুভক্ত পিতার উপযুক্ত কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া। এই অল্প বয়সেই সে পরম ভক্তিমতী। বাড়ির ঠাকুর ঘরের দায়িত্ব তাঁর ওপর। প্রতিদিন তিনবার গঙ্গাস্নান তাঁর কাছে বাধ্যতামূলক ছিল। এর উদাহরণও পাই চৈতন্য ভাগবতেই—

শিশু হইতে দুই-তিন-বার গঙ্গাস্নান।
পিতৃ মাতৃ-বিষ্ণু-ভক্তি বিনে নাহি আন ॥ ৪৬ ॥

কখনো জননীর সঙ্গে কখনো সখীদের সঙ্গে, বিষ্ণুপ্রিয়া গঙ্গাস্নানে যেতেন। গঙ্গার ঘাটে চলার পথে নিমাই যেমন রূপে গুণে সবার মুখে মুখে ফিরতেন পরমা সুন্দরী বিষ্ণুপ্রিয়াও তেমনি ছিলেন সবারই আলোচ্য বিষয়। গঙ্গারঘাটে গৌরসুন্দরের জননী শচীদেবীর সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার নিয়মিত যোগাযোগ ঘটত। বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়ার ভক্তি ও নম্র মধুর স্বভাব শচীদেবীকেও আকৃষ্ট করেছিল। ঘাটে যখনই দেখা হয় বিষ্ণুপ্রিয়া নম্রভাবে

শচীদেবীকে প্রণাম করেন। শচীদেবীও সস্নেহে ও পুলকিত মনে বালিকাকে 'যোগ্যপতি হউক' বলে আশীর্বাদ করতেন। চৈতন্য ভাগবতে ঃ

"আইরে দেখিয়া ঘাটে প্রতি দিনে দিনে।
নম্র হই' নমস্কার করেন চরণে ॥ ৪৭ ॥
আইও করেন মহাপ্রীতে আশীর্ব্বাদ।
'যোগ্য-পতি' কৃষ্ণ তোমার করুণ প্রসাদ" ॥ ৪৮ ॥

গৌরাঙ্গদেবের প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিরহ বিদায় শচীমাতাকেও বেদনাদগ্ধ করেছিল। তাঁর সোনার সংসারে এসেছিল শূন্যতা। গৌরাঙ্গ সম্পর্কেও তাঁর দুশ্চিন্তা ও আশংকা ছিল খুব। একটাই ভয়, সংসারে আসক্তিশূন্য পুত্র পাছে বিবাগী হয়। পুত্রকে পুনরায় সংসারী করতে ও সংসারী দেখতে, পুনরায় বিবাহ শৃংখলে আবদ্ধ করতে তিনি উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে প্রিয়তমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিদায়ের কথ শুনে হৃদয়ে দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন গৌরাঙ্গ। যাতনা থেকে নিবৃত্তি পেতে তিনি পড়াশুনায় আরও গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। তাঁর খ্যাতি ও পাণ্ডিত্য শুধুমাত্র নবদ্বীপই নয়, ক্রমশঃ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই রকম সময়েই পুত্রকে পুনরায় গার্হস্থ্যজীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শচী-দেবী তোড়জোর শুরু করে দেন। চৈতন্য ভাগবতকারের কথায়—

হেনমতে বিদ্যারসে আছেন ঈশ্বর।
বিবাহের কার্য্য শচী চিন্তে নিরন্তর ॥ ৩৮ ॥

আত্মীয় স্বজনগণও তাড়াতাড়ি শুভকার্য সম্পন্ন করার জন্য পরামর্শ দিলেন। এদিকে কন্যার বয়স দেখে সনাতন মিশ্রও একটি উপযুক্ত পাত্র অনুসন্ধান করছিলেন। নবদ্বীপে তখন বৈদিক ব্রাহ্মণের সংখ্যা ছিল খুব কম। সুপাত্র পাওয়া কঠিন। ভীষণ চিন্তিত মিশ্র দম্পতি। চৈতন্য ভাগবতে—

সর্ব্ব নবদ্বীপে শচী নিরবধি মনে।
পুত্রের সদৃশ কন্যা চাহে অনুক্ষণে ॥ ৩৯ ॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা ভাগ্যবান।
দয়াশীল স্বভাব—শ্রীসনাতন নাম ॥ ৪০ ॥
... ...
তাঁর কন্যা আছেন পরম সুচরিতা।
মূর্তিমতী লক্ষ্মীপ্রায় সেই জগন্মাতা ॥ ৪৪ ॥

প্রাত্যহিক কর্মের মতই নিত্যস্নানে যান বিষ্ণুপ্রিয়া। শচীমাতার মনোগত ইচ্ছা গঙ্গাস্নানরত এই পরম সুলক্ষণা কন্যাকে পুত্রবধূ করা যায় কিনা। বৃন্দাবন দাসের ভাষায়—

শচীদেবী তাঁরে দেখিলেন যেইক্ষণে
এই কন্যা পুত্রযোগ্যা,—বুঝিলেন মনে ॥ ৪৫ ॥
— — — — — — — — —
গঙ্গাস্নানে আই মনে করেন কামনা।
"এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা" ॥ ৪৯ ॥

রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্র এবং শচীমাতা উভয়েরই মনোগত ইচ্ছা এক। এদিকে বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া গঙ্গারঘাটে তাঁর সমবয়সী সখিদের মুখ থেকে নিমাই পণ্ডিতের কথা শুনেছিলেন এবং ঘাটে একদিন নিমাই পণ্ডিতের দেখা পেয়ে মনে মনেই তাঁর পাদপদ্মে আত্ম সমর্পণ করে বসেছিলেন। নবদ্বীপ দীপশিখায় বলা হয়েছে ঃ

"এমন সময়, একদিন সকালে সখিদের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করে ফেরবার সময় সহসা চোখে পড়ল, এক ভুবন মোহন অতুলনীয় রূপবান যুবককে। সখিরা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, এই সেই নিমাই পণ্ডিত। চিনতে দেরি হল না বিষ্ণুপ্রিয়ারও, এই ই ত সেই নিমাই পণ্ডিত, যার চাপল্য, যার রূপ, যার পাণ্ডিত্য সারা নবদ্বীপে আজ মুখরিত হয়ে উঠেছে। মনে মনে শ্রীবিষ্ণুর পায়ে অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, বিনম্র হৃদয়ে সকল ভক্তি প্রীতি নিবেদন করে দিল এক মহামানবের পায়ে।

চমকিত হল নিমাই-ও। পথে চলতে চলতে সহসা এ কাকে দেখল শ্রীগৌরাঙ্গ। চিনতে বাকি রইল না বিষ্ণুপ্রিয়াকে, থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন পথের মাঝে। মনে পড়ল, বহু যুগ আগের কোন স্মৃতি? বুকের ভিতর একটা আলোড়ন উঠতে লাগল। কোথায়? কোথায় কতদূরে তর্ তর্ করে বয়ে যাওয়া যমুনার কালো জল, মনে কি পড়ছে কোন্ কদম্বমূলের বংশী-বাদন?"

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ লিখেছেন—"কন্যাকালে নিমাই পণ্ডিতকে মনে মনে আত্ম সমর্পণ করিয়া বালিকাটি বড় ফাঁপড়ে পড়িয়াছিলেন, মুহুর্মুহুঃ গঙ্গাস্নান করিতে আসেন ; মনে আশা—তাঁহার বরকে দেখিতে পাইবেন।"

এদিকে শচীদেবী পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহ দেবার জন্য একেবারে মনস্থির করে ফেলেছেন। সনাতন-দুহিতা বিষ্ণুপ্রিয়াই গৌরাঙ্গের বক্ষ

বিলাসিনী হোক এই-ই তাঁর মনোগত ইচ্ছা। গৌরাঙ্গ শচীদেবীর এই ইচ্ছার কথা জানতে পেরে বুঝলেন যে মায়ের ইচ্ছাতে আর অমত করা যাবে না। মনে মনে তিনি রাজিই হলেন। গৌরাঙ্গর বয়স তখন ২০ বছর। বিষ্ণুপ্রিয়ার ১২ বছর। ওদিকে সনাতন মিশ্ররও একই ইচ্ছা গৌরাঙ্গদেবকে জামাই হিসেবে গ্রহণ করা। তাঁর কপালে এমন সৌভাগ্য হবে কিনা তা তিনি ভেবেই চলেছেন দুরু দুরু বুকে। চৈতন্য ভাগবতে আছে ঃ

"রাজ পণ্ডিতের ইচ্ছা সর্ব্ব-গোষ্ঠীসনে।
প্রভুরে করিতে কন্যা-দান নিজ মনে" ॥ ৫০ ॥

শচীমাতা আর দেরি না করে কাশীনাথ পণ্ডিতকে ডেকে এনে নিজেই উদযোগী হয়ে শুভ বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে সনাতন মিশ্রের বাড়িতে পাঠালেন।

"দৈবে শচী কাশীনাথ পণ্ডিতেরে আনি।
বলিলেন তাঁরে,—বাপ, শুন এক বাণী ॥ ৫১ ॥
রাজ পণ্ডিতেরে কহ,—ইচ্ছা থাকে তান।
আমার পুত্রেরে করুন কন্যা দান" ॥ ৫২ ॥
কাশীনাথ পণ্ডিত চলিলা সেইক্ষণে। [ঐ]

ওদিকে মিশ্র দম্পতি যখন কন্যার বিবাহ বিষয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন, ঠিক তখনই ঘটক কাশীনাথ পণ্ডিত সনাতন মিশ্রর বাড়িতে গিয়ে হাজির। উত্তম পাত্রের সংবাদের আশায় তারা উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে রইলেন ঘটকের দিকে চেয়ে। বিষম ঘোর পণ্ডিত সনাতনের মনে। কাশীনাথ বলে কি ? তিনি যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছেন না। একি স্বপ্ন না সত্যি ? কাশীনাথ তাঁর মনের একান্ত ইচ্ছাটি জানতে পারল কিভাবে ? কাশীনাথ পণ্ডিত কিন্তু হাসতে হাসতে অতি স্বাভাবিকভাবেই বললেন—

বিশ্বম্ভর পণ্ডিতেরে তোমার দুহিতা।
দান কর'—এ সম্বন্ধ উচিত সর্ব্বথা ॥ ৫৭ ॥
তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্যপতি।
তাঁহার উচিত এই কন্যা এই মহা-সতী ॥ ৫৮ ॥
যেন কৃষ্ণে রুক্মিণীতে অন্যোহন্য-উচিত।
সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া-নিমাঞি পণ্ডিত ॥ ৫৯ ॥ [ঐ]

এই জুটির বিবাহের কথা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। আনন্দ সকলের

মনেই। মহাখুশী শচীদেবী। গৌরাঙ্গদেবের বিয়ে কি ভাবে হবে তা নিয়ে ধনাঢ্য শিষ্যদের মধ্যে চলতে লাগল গভীর আলোচনা।

প্রভুর বিবাহ শুনি' সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
সবেই হইলা অতি পরানন্দ মন ॥ ৬৮ ॥
প্রথমে বলিলা বুদ্ধিমন্ত —মহাশয়।
"মোর ভার এ-বিবাহে যত লাগে ব্যয়" ॥ ৬৯ ॥
মুকুন্দ সঞ্জয় বলে,—"শুন, সখা ভাই!
তোমার সকল ভার, মোর কিছু নাই? ৭০ ॥
বুদ্ধিমন্ত-খান বলে, "—শুন, সখা ভাই!
বামনিয়া সজ্জ এ-বিবাহে কিছু নাই ॥ ৭১ ॥
এ-বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন।
রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন" ॥ ৭২ ॥ [ঐ]

শুভদিনে শুভক্ষণে রীতিমত রাজকুমারের বিবাহেব সমারোহে গৌরাঙ্গ বিবাহ করতে চললেন। মাতা শচীদেবীর হৃদয়ে আনন্দের উৎসারণ। তিনি সমস্ত লোকাচার সম্পন্ন করেছেন সবাইকে সঙ্গে নিয়ে খুব জাঁকজমক সহকারে। নর্তন, বাদ্য, গীত, বাজি, ভাটেদের গান, দীপ, নাবীদের উলুধ্বনি, শঙ্খ-ধ্বনির মধ্যে দিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ গোধূলি লগ্নে সনাতন মিশ্রের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছুলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বাড়িতে বিবাহের অধিবাসে এমন জিনিসের ছড়াছড়ি হয়েছিল যে তাতে আরও বেশ কয়েকটা শুভবিবাহ সম্পন্ন হতে পারত।

নিমাই বিবাহ করতে রওনা হলে সখী ও পতিব্রতাদের নিয়ে শচীদেবী আনন্দ করতে লাগলেন। তাঁর স্বপ্ন নিমাই আবার সংসারী হবে। সনাতন মিশ্রর বাড়িতেও বিয়ের বিপুল আয়োজন। যেন একটা দর্শনীয় প্রতি-যোগিতা চলছে কারা কত বেশি ও সুন্দরভাবে আয়োজন ও কর্ম সুসম্পন্ন করতে পারেন।

এ সময়ে নবোদ্ভিন্না যৌবনা বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপের বর্ণনা দিয়েছেন নরোত্তম দাস তাঁর "শ্রী গৌরাঙ্গ প্রেম" কাব্য গ্রন্থে—

"শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়ারূপ মধুর মূরতি।
শত কোটী চন্দ্র জিনি শ্রীমুখের জ্যোতি ॥
সুকৃষ্ণ লম্বিত কেশ শোভার আধার।
ভুরু দুটি বাঁকা কাম ধনুক আকার ॥

মৃগ আঁখি জিনি আঁখি প্রেমের কটাক্ষ।
সে কটাক্ষে বিঁধে ভক্ত প্রেমিকের বক্ষ ॥
গৃধ্র কর্ণ জিনি কর্ণ সুশোভিত অতি।
সুবর্ণ কুণ্ডল তাহে ঝলমল ভাতি ॥
তিল ফুল জিনি নাসা সৌন্দর্য্য প্রকাশে।
কত সুধা গন্ড দেশে মৃদু মন্দ হাসে ॥
কি সুন্দর ওষ্ঠদ্বয় জিনি বিম্বফল।
দন্ত পংক্তি মুক্তা ভাতি অতীব উজ্জ্বল ॥
কম্বু জিনি গ্রীবাদেশ শোভা মনোরম।
কমল মৃণাল ভুজ সৌন্দর্য্য অসীম ॥
করাঙ্গুলি গুলি জিনি স্বর্ণ চাঁপা কলি।
তাহে সুশোভিত পুনঃ নখপদ্ম গুলি ॥
বক্ষদেশে যুগ্ম গিরি শোভে উচ্চ শীর।
ক্ষীণ কটি অনুপম নাভি সুগভীর ॥
নিতম্ব অত্যন্ত শোভা অতুল্য জগতে।
রম্ভা তরু যুগ্ম উরু তাহে সুশোভিতে ॥
বিশ্ব বিমোহন রূপ মাধুর্য্য সমুদ্র।
কি বর্ণিব রূপ—তত্ত্ব আমি অতি ক্ষুদ্র ॥
পদ যুগে কত রূপ দিলেন বিধাতা।
রক্তোৎপল পদতল অতি সুশোভিতা ॥
দেখিয়া পদের শোভা স্বর্গলোকবাসী।
রূপরসে অনুরাগে গেল পদে মিসি ॥
সাক্ষ্য দিতে র'ল কিন্তু নখে শশি ভাসি।
এ পদ পুজিলে তৃপ্ত সপ্তলোকবাসী ॥
এমনি রূপের ছটা ত্রৈলোক্য মোহিত।
আপনি গৌরাঙ্গ চন্দ্র রসেঃ পুলকিত ॥
নানা রত্ন বস্ত্র অলঙ্কারে বিভূষিতা।
প্রেমিক শেখর গৌর হৃদি বিরাজিতা ॥

গৌরাঙ্গের বিবাহ যাত্রার সঙ্গে যে বাজনার দল এসেছিল তার বর্ণনায় চৈতন্য ভাগবতে দেখি—

জয়ঢাক, বীরঢাক, মৃদঙ্গ, কাহাল।

পটহ, দগড়, শঙ্খ, বংশী, করতাল ॥ ১৪৮ ॥
করঙ্গ, শিঙ্গা, পঞ্চশব্দী বাদ্য বাজে যত।
কে লিখিবে,—বাদ্যভাণ্ড বাজি' যায় কত ? ১৪৯ ॥
লক্ষ লক্ষ শিশু বাদ্যভাণ্ডের ভিতরে।
রঙ্গে নাচি' যায়, দেখি হাসেন ঈশ্বরে ॥ ১৫০ ॥

বিয়ে বাড়িতে কন্যাপক্ষ ও পাত্রপক্ষের বাজিয়েরা পালা করে বাজাতে লাগল। উপস্থিত অভ্যাগতরা তা উপভোগ করতে থাকলেন। সনাতন মিশ্র ও তাঁর পত্নী প্রথামত জামাই বরণ ও মাঙ্গলিক ক্রিয়া সমূহ সম্পন্ন করলেন। সময় মত বিয়ের কনে লজ্জানম্র বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ আসরে আনা হল।

তবে সর্ব্ব—অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া।
লক্ষ্মী দেবী আনিলেন আসনে ধরিয়া ॥ ১৭০ ॥
তবে হর্ষে প্রভুর সকল আপ্তগণে।
প্রভুরেহ তুলিলেন ধরিয়া আসনে ॥ ১৭১ ॥
তবে মধ্যে অন্তঃপট ধরি' লোকাচারে।
সপ্ত প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্যারে ॥ ১৭২ ॥
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি' সাত বার।
রহিলেন সম্মুখে করিয়া নমস্কার ॥ ১৭৩ ॥ [ঐ]

বর-কনের ওপর পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকল। উপস্থিত স্ত্রী পুরুষেরা বর কনের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। দু'পক্ষের বাদ্যকরগণ মহানন্দে বাদ্য বাজাতে লাগল। যেন আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। এবার মালা বদলের সময়।

আগে লক্ষ্মী জগন্মাতা প্রভুর চরণে।
মালা দিয়া করিলেন আত্ম-সমর্পণে ॥ ১৭৬ ॥
তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া ॥ ১৭৭ ॥ [ঐ]

চৈতন্য ভাগবত অনুসারে এই বিবাহ আসরে দেবতাগণও অলক্ষ্যে থেকে পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন। বধূ বড় না বর বড় এই নিয়ে বিবাদ শুরু হল দু' পক্ষের মধ্যে এবং পিঁড়ি উঁচু করে ধরা হ'ল। শুভ দৃষ্টিপাত শেষে বর কনে এসে বসলেন বিয়ের পিঁড়িতে। পাদ্য অর্ঘ্য আচমন করে সনাতন মিশ্র এবার বসলেন কন্যা সম্প্রদান করতে। বহু যৌতুক সহ কন্যা সমর্পিত হলো গৌরাঙ্গ হস্তে। যেমন—

বিষ্ণুপ্রীতি কাম্য করি শ্রীলক্ষ্মীর পিতা।
প্রভুর শ্রীহস্তে সমর্পিলেন দুহিতা ॥ ১৮৮ ॥
তবে দিব্য ধেনু, ভূমি, শয্যা, দাসী, দাস।
অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাস ॥ ১৮৯ ॥

বিয়ে সুসম্পন্ন হলে মিশ্রপত্নী বরকন্যাকে ঘরে তুললেন মঙ্গলধ্বনির মধ্যে দিয়ে। বাসর ঘরে প্রবেশ করে গৌরপ্রিয়ার মনের অবস্থাটি কেমন হয়েছিল ও ঘরে ঢুকতেই যে দুর্দৈব ঘটেছিল তার বর্ণনা পাই 'বিষ্ণুপ্রিয়া চরিতে।' যেমন—"আজ বালিকা প্রাণের বস্তুটি পেয়েছেন। তাঁর সাধনার ধন মিলেছে। যাঁর জন্য দিনে তিনবার গঙ্গাস্নান করতেন, দেবমূর্ত্তি দেখলেই ভক্তিভরে প্রণাম করে যাঁকে প্রাপ্তির আশায় করযোড়ে প্রার্থনা করতেন আজ সেই প্রাণের বস্তুটি, সেই হারাধনটি, তাঁর দক্ষিণে দণ্ডায়মান। আবার শুধু দাঁড়িয়েই নেই। তিনি তাঁর অঙ্গস্পর্শ সুখ অনুভব করছেন। পতিমুখ দর্শনে, পতি অঙ্গ স্পর্শনে যে কত সুখ, তা যার পতি আছে সেই জানে।··· ··· ··· ··· এমন সময়ে দেবীর দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠে একটি গুরুতর উছট্ লাগল। উছটের দারুণ আঘাতে দেবীর চৈতন্য হ'ল, বড় ব্যথা পেলেন। দেখলেন, অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে রক্তপাত হচ্ছে। এই দুর্দৈব ঘটনার কারণ আসলে দেবীর অন্যমনস্কতা। আনন্দে অধীরা হয়ে তিনি চলছেন। তাঁর বাহ্যদৃষ্টি একেবারে লোপ পেয়েছিল। এই গুরুতর আঘাতে দেবীর জ্ঞান হ'ল; এবং সঙ্গে সঙ্গে এটি অমঙ্গলের কারণ বুঝতে পেরে মনে বড় ব্যথা পেলেন। সশঙ্কিতা হয়ে প্রাণ বল্লভের অঙ্গে ঢলে পড়লেন। এই উছট্ খাওয়ার বৃত্তান্তটি আর কেউ জানতে পারল না। কেবলমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গই জানলেন। প্রিয়াকে সশঙ্কিতা ও কাতরা দেখে প্রভু ব্যথিত হলেন। আর কি করলেন শুনুন। আঘাতের ওষুধ দিলেন। সে ওষুধ কেউ কখনও পায় না। প্রভুর নিজের ডান পায়ের আঙ্গুল দিয়ে প্রিয়ার আঘাতপ্রাপ্ত আঙ্গুল চেপে ধরলেন। প্রভুর পদরজ মহৌষধে তখনি রক্তপাত বন্ধ হয়ে গেল। দেবীরও সব ব্যথা দূর হল। স্বামীর সাঙ্কেতিক সহানুভূতিতে প্রিয়াজির সব দুঃখ দূর হল। অমঙ্গল ও সন্দেহের কারণও দূর হয়ে দেবীর হৃদয়ে আবার আনন্দ তরঙ্গ উঠল, আবার তিনি প্রেমানন্দে ভাসতে ভাসতে প্রাণবল্লভের সঙ্গে বাসর ঘরে চললেন।"

বাসর ঘরে বিষ্ণুপ্রিয়ার সখিরা নব বর গৌরাঙ্গকে নিয়ে নানা রঙ্গরসে মেতে উঠলেন। লোচন দাস তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে বর্ণনা দিয়েছেন—

কেহো বলে গোরাচাঁদ শুন মোর বোল।
গুয়াখানি দেহ লক্ষ্মী নিঁদে হৈল ভোর ॥
আপনে তুলিয়া দেহ লক্ষ্মীর বদনে।
দেখুক সকল সখী হরষিত-মনে ॥ ৩২১ ॥

রঙ্গরসে কোনো রসিকা রমণী গৌরাঙ্গের কোলেই ঢলে পড়ছেন। কেউ বা অতি সাহসে ভর করে বিষ্ণুপ্রিয়াকে গৌরাঙ্গের কোলে তুলে বসিয়ে দিচ্ছেন।

অঙ্গে ঢলি পড়ে কেহো—হিয়া উতরোল।
লক্ষ্মীরে তুলিয়া দেই গোরাচাঁদের কোল ॥
কেহো বলে— হেন ভাগ্যবতী কেবা আছে।
গৌরচন্দ্র-হেন পতি মিলিয়াছে কাছে ॥ ৩২২ ॥ [ঐ]

বধূ নিয়ে যেদিন গৌরাঙ্গ স্বীয় গৃহে ফিরে এলেন সেদিন নবদ্বীপের রাস্তায় রাস্তায় ছিল জন সমুদ্রের ঢল। চঞ্চল সারা নদীয়ার মানুষ। গৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলরূপ দর্শন করে বিভিন্ন জন নানা মন্তব্য করতে লাগলেন। কেউ বললেন 'লক্ষ্মীনারায়ণ', কেউ বলেন,সাক্ষাৎ হরপার্বতী। কেউ বা বলেন এঁরা স্বয়ং 'কামদেব রতি'। চৈতন্যভাগবত থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক :

"অল্প-ভাগ্যে কন্যার কি হেন স্বামী মিলে ?
এই হর-গৌরী হেন বুঝি"—কেহ বোলে ॥ ১১২ ॥
কেহ বোলে, ইন্দ্র-শচী, রতি বা মদন।"
কোন নারী বোলে,—"এই লক্ষ্মী-নারায়ণ" ॥ ১১৩ ॥
কোন নারীগণ বোলে—"যেন সীতা রাম।
দোলে পরি শোভিয়াছে অতি-অনুপম" ॥ ১১৪ ॥
এইমত নানারূপে বোলে নারীগণে।
শুভদৃষ্ট্যে সবে দেখে লক্ষ্মী-নারায়ণে ॥ ১১৫ ॥

শচীদেবীও নিজবাড়িতে সই ও এয়োগণকে নিয়ে মঙ্গলঘট পেতে বরণডালা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন পুত্র ও পুত্রবধূকে বরণ করে ঘরে তোলার জন্য।

হেনমতে নৃত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহলে।
নিজগৃহে প্রভু আইলেন সন্ধ্যাকালে ॥ ১১৬ ॥
তবে শচীদেবী বিপ্রপত্নীগণ লৈয়া।
পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন হর্ষ হৈয়া ॥ ১১৭ ॥
দ্বিজ—আদি যত জাতি নট রাজনিয়া।
সবারে তুষিলা ধন, বস্ত্র, বাক্য দিয়া ॥ ১১৮ ॥ [ঐ]

সবাইকে বিদায় দেবার পর আঙিনা থেকে মঙ্গলাচার সেরে গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহের অভ্যন্তরে গেলেন। বৃন্দাবন দাস একটি পদাবলীতে বলেছেন—

গৃহে আসি বসিলেন লক্ষ্মী নারায়ণ।
জয়ধ্বনিময় হৈল সকল ভবন॥
কি আনন্দ হৈল সেই অকথ্য কথন
সে মহিমা কোন জনে করিবে বর্ণন॥

শচীদেবীর দান ধ্যান পর্ব সমাধা হলে গৌরাঙ্গ বুদ্ধিমন্ত খানকে আলিঙ্গন দিয়ে কৃতার্থ করলেন। বুদ্ধিমন্তের জন্যই এই বিবাহ মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হল। বুদ্ধিমন্ত গৌরাঙ্গর আলিঙ্গনে আনন্দিত হল। গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ মহিমা সম্পর্কে চৈতন্য ভাগবতে বলা হয়েছে—

যে শুনয়ে প্রভুর বিবাহ-পুণ্য-কথা
তাহার সংসার—বন্ধ না হয় সর্ব্বথা॥ ১১৯
প্রভু পার্শ্বে লক্ষ্মীর হইল অবস্থান।
শচীগৃহ হইল পরম—জ্যোতিধাম॥ ১২৩॥

গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার এই শুভ বিবাহানুষ্ঠানে শান্তিপুর থেকে সস্ত্রীক অদ্বৈতপ্রভু এসেছিলেন ও আনন্দ উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। এই বিবাহানুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে তাঁরাও আনন্দিত। আনন্দের বন্যা শচীদেবীর ঘরে। লজ্জা নম্র বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া বধূবেশে আরও লজ্জাশীলা হয়ে উঠেছেন। মনে তাঁর পতি মিলনের আনন্দ। গৌরাঙ্গের মুখেও হাসির রেখা। বলরাম দাস রচিত পদাবলীতে নববিবাহিত দম্পতির আনন্দ উচ্ছ্বাসের বর্ণনা পাওয়া যায়—

নবীনা প্রিয়াজি কেবল যৌবন উদয়।
লজ্জায় মুগধ ধনী অধোমুখে রয়॥
চঞ্চল চরণে গৃহ-কোণেতে লুকায়।
শ্রী গৌরাঙ্গ গৃহ মাঝে খুঁজিয়া বেড়ায়॥

বিয়ের পর পরই গৌরাঙ্গ অধ্যাপনার কাজে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেন। নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিতের খ্যাতি তখন সবাইকে ছাপিয়ে গেছে। এমন সময় নবদ্বীপেই এলেন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরী। তিনি নিমাই পণ্ডিতের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজয় স্বীকার করে নিলেন। এই

আকস্মিক ঘটনায় দিকে দিকে নিমাই পণ্ডিতের খ্যাতি ও যশ বহু সহস্র গুণ বৃদ্ধি পেয়ে পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। নামী দামী ও বিষয়ী লোকেরা নিমাই পণ্ডিতকে রাস্তায় দেখলে অথবা বাড়ির সামনে দিয়ে গেলে তারা দোলা থেকে নেমে আগে তাঁকে নমস্কার জানান। তাদের বাড়িতে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান হলে নিমাই পণ্ডিতের বাড়িতে আগেই ভোজ্য বস্ত্র মিষ্টান্ন পাঠাতে ভোলেন না। মাতা শচীদেবী মনের আনন্দে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও দীন দুঃখীদের সেবায় সারা দিনই ব্যস্ত থাকেন। গৌরাঙ্গ এ সবের কোনও খোঁজই নেন না। বিষ্ণুপ্রিয়া রাজকন্যা সমপ্রায় হয়েও শ্বশুর বাড়িতে কিন্তু একেবারে সাধারণ গৃহবধূর মত সুন্দর মানিয়ে নিয়েছেন। তিনি শাশুড়ির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে রেখেছেন। বৃদ্ধা শাশুড়ি যেখানেই কাজে ব্যস্ত সেখানেই তিনি তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করেন। পতিদেবতার সেবাতেও তিনি ততোধিক মগ্ন।

বিষ্ণুপ্রিয়ার বয়স তখন সবে ১৩ বছর। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে তাঁর অবস্থান। মনে আনন্দের ফল্গুধারা সখিদের কাছে মাঝে মাঝেই প্রকাশ হয়ে পড়ত। তবে গৌরাঙ্গদেব অধ্যাপনায় অত্যধিক ব্যস্ত থাকার ফলে বিষ্ণুপ্রিয়া সব সময় তাঁকে কাছে পেতেন না। সংসারের অন্য কাজে বিষ্ণুপ্রিয়া ব্যস্ত থাকলেও শচীমাতা রান্নার ভারটা নিজের হাতেই রেখেছিলেন। পুত্রকে পরম যত্নে কাছে বসিয়ে খাওয়াতে তিনি খুবই তৃপ্তি পেতেন। আর অন্তরালে বসে বিষ্ণুপ্রিয়া এই দৃশ্য দেখে আনন্দিত হতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহলক্ষ্মী হয়ে আসার পর থেকে শচীমাতার সঙ্গে তাঁর এমন হার্দিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যে শাশুড়ি বধূমাতা একে অপরকে না দেখে একদণ্ডও থাকতে পারতেন না। আর তাই বধূকে পিতৃগৃহে পাঠিয়ে স্বস্তিতে থাকতেন না শচীমাতা। বিষ্ণুপ্রিয়াও তেমনি বাপের বাড়ি থেকে স্বামীগৃহে ফিরে আসার জন্য সদা চঞ্চল ও উন্মুখ হয়ে রইতেন। এই ভাবেই যখন শচীমাতার সুখের সংসারে আনন্দ তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে ঠিক তখনই গৌরাঙ্গদেব গয়াযাত্রার কথা মায়ের কাছে জানালেন। শান্ত পুকুরের স্থির জলের ওপর একটি ঢিল ছুঁড়লে যেমন হয় ঠিক তেমনই শচীমাতার হৃদয় সমুদ্র তোলপাড় হল। প্রাণ-পণে পুত্রের হাত চেপে ধরলেন তিনি। বললেন,—গয়া যাওয়া হবে না। বিশ্বরূপ একবার ঘরের বাইরে বেরিয়ে গৃহপ্রবেশ করেনি। তাই কনিষ্ঠ পুত্রের কাছে তাঁর সকাতর আবেদন :

শচীর অন্তর পোড়ে—গদ গদ ভাষ।
পুত্রের নিকট গিয়া ছাড়য়ে নিঃশ্বাস ॥
প্রবাসে যাইছ তুমি শুন বিশ্বম্ভর।
তুমি না রহিলে অন্ধকার মোর ঘর ॥ ৪৬৯ ॥

[চৈতন্যমঙ্গল — লোচন দাস]

পুত্র নিমাই মাতাকে বোঝালেন পিতৃকার্য সমাপনান্তে গয়া যাচ্ছি অতএব পুত্রের এই অবশ্য কর্তব্য কর্মে বাধাদান উচিত নয়। অগত্যা মাতা শচীদেবী পুত্রকে নিরস্ত করতে না পেরে গয়া যাবার অনুমতি দিলেন এবং অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আবেদন জানালেন ঃ

অন্ধলের লড়ি তুমি—নয়ানের তারা।
এ দেহের আত্মা তোমা বহি নহি মোরা ॥
পিতৃগণ নিস্তার করিতে যাবে তুমি।
আপনা লাগিয়া তোরে কি বলিব আমি ॥
গয়া যদি যাবি বাপ! শুন রে নিমাই।
মোর নামে এক পিন্ড দিস্‌রে তথাই ॥ ৪৭০ ॥ (ঐ)

গৌরাঙ্গদেবের গয়া যাবার সংবাদে বিষ্ণুপ্রিয়ার মধ্যেও আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। ত্রয়োদশবর্ষীয়া পতিবিরহ কাকে বলে জানেন না। প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের কথাই তাঁর জীবনের অন্যতম ধ্যান-জ্ঞান। এই রকম মানসিক অবস্থায় পতির গয়া যাবার সংবাদে তিনি সশঙ্কিতা হয়ে উঠলেন। বিয়ে হয়েছে তো মাত্র একটি বছর। বিরহ কি জিনিস তা তিনি এই প্রথম অনুভব করছেন। 'পরমা প্রকৃতি বিষ্ণুপ্রিয়া গ্রন্থে' দেখি ঃ "বিষ্ণুপ্রিয়া সেখানে দাঁড়িয়ে আড়াল থেকে সব শুনছেন। তাঁর অন্তর তখন বাণবিদ্ধ বিহঙ্গিনীর মত ছট্‌ফট করছে। দুটি চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। মনটা হাহাকার করে ওঠে তাঁর। একবার ভাবেন বাধা দেবেন।—কিন্তু তা পারেন না কিছুতেই। মা যেখানে বাধা দিলেন না, সেই পরম পিতৃকাজে তিনি বাধা দেবেন কেমন করে?"

অবশ্যই গৌরাঙ্গদেব গয়া যাবার আগে বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে বিদায় নিতে গেলেন। নির্জনে প্রিয়াকে ডেকে বললেন, আমি পিতৃকার্য করতে যাচ্ছি। এই শীতের মধ্যেই ফিরব। তুমি সর্বদাই জননীর কাছে থাকবে এবং তাঁর সেবা করবে। বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর মুখের দিকে অসহায় হরিণীর চোখ তুলে ধরলেন। বাক্য স্ফুরিত হল না একটাও। শুধু ঝরে পড়ল টপ্ টপ্ করে ক'ফোটা

জল। ব্যথিত গৌরাঙ্গদেব প্রিয়াকে বক্ষালিঙ্গন দিলেন। 'পদ সমুদ্রে' দেখি, বিষ্ণুপ্রিয়ার অবুঝ মনের প্রতিবিম্ব।

কোথা যাও হে প্রাণ বঁধু মোর
আমায় ছলনা করি।
না দেখিলে মুখ ফাটে মোর বুক
ধৈরয ধরিতে নারি ॥
বাল্যকাল হতে এ দেহ সঁপিনু
মনে আন্ নাহি জানি।
কি দোষ পাইয়া ত্যজিলে দাসীরে
বল সেই কথা শুনি ॥

[বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত থেকে সংগৃহীত]

পতি বিচ্ছেদ জনিত বিরহ বেদনা বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে খুবই অসহ্য মনে হল। সখী কাঞ্চনা তাঁর বিরহ দূর করার জন্য সান্ত্বনা দেন। পূজার ফুল তুলতে সাথে করে নিয়ে যান। এক সাথে মালা গেঁথে লক্ষ্মী নারায়ণকে সাজান। অন্য-দিকে গৌরাঙ্গদেবের অবর্তমানে শাশুড়ি-বধূতে মিলে অতিথি সেবায় অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকায় বিরহ যন্ত্রণা তীব্রতর হয়ে উঠতে পারেনি। অবশ্য একাকী কিংবা সখি সান্নিধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া পতিদেবতার আলোচনা ও স্মৃতি রোমন্থনেই মগ্ন থেকেছেন। 'বিষ্ণুপ্রিয়া চরিতে' দেখি, শাশুড়ী পুত্রবধূতে এক প্রাণ হয়ে দেব-সেবা, অতিথি সেবা প্রভৃতি ধর্ম কার্যে দিনাতিপাত করতে লাগলেন। আর উৎকণ্ঠিত চিত্তে উভয়েই গৌরাঙ্গদেবের গয়াধাম থেকে প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলেন, দিন গুণতে শুরু করলেন।

ওদিকে গয়াধামে গিয়ে গৌরাঙ্গদেবের মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। তাঁর মুখে শোনা যায় কৃষ্ণ গুণগান। পথ হাঁটতে হাঁটতে তিনি সঙ্গীদের অহরহই বলেন 'কৃষ্ণকথা।' তাঁর মতে 'কৃষ্ণভজনা' যে না করে সে পশুসমান। লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলে পাই—

সঙ্গিগণে হাসিয়া বুঝান ভগবান।
যে ভাব মানুষে সে পশুতে বিদ্যমান ॥
কৃষ্ণ-জ্ঞান নাই মাত্র পশুর শরীরে।
মানুষে না ভজে কৃষ্ণ—পশু বলি তারে ॥
এত বুঝাইয়া প্রভু—জগতের গুরু।
চলিলা পথেতে প্রভু—বাঞ্ছা কল্পতরু ॥ ৪৭৬ ॥

পূর্ব পুরুষদের প্রীতি ও পিতৃপিণ্ড দান করার পর বিষ্ণুপাদ-পদ্ম দর্শন করে গৌরাঙ্গদেবের ইচ্ছা হল, গয়া থেকে সোজা বৃন্দাবন যাবেন। এই ইচ্ছা তিনি সঙ্গী সাথীদের কাছে প্রকাশ করে সমর্থন পাবার জন্য যুক্তি দেখান—

সার্থক মনুষ্য-জন্ম কৃষ্ণ যদি ভজে।
না ভজিলে কৃষ্ণ—দুঃখ—সাগরেতে মজে ॥ [ঐ]

কিন্তু আকাশবাণী হল তাঁর এখনও বৃন্দাবন যাবার সময় হয়নি। অবশ্য-কর্তব্য হিসেবে সঙ্গী সাথীরা তাঁকে বাড়ির পথে ফিরিয়ে আনলেন। গৌরাঙ্গ-দেব নবদ্বীপে ফিরে এলে বিষ্ণুপ্রিয়ার বাপের বাড়ি এবং শচীদেবীর দুঃখ-রাশি মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। আনন্দসাগরে অবগাহিত করতে লাগলেন তাঁরা। চৈতন্য ভাগবতে—

হইলা আনন্দময়ী শচীভাগ্যবতী।
পুত্র দেখি' হরিষে না জানে আছে কতি ॥ ১৮ ॥
লক্ষ্মীর জনক-কুলে আনন্দ উঠিল।
পতিমুখ দেখিয়া লক্ষ্মীর দুঃখ-দূরে গেল ॥ ১৯ ॥

বিষ্ণুপ্রিয়ার আনন্দ তো বর্ণনার অতীত। তাঁর মনের অবস্থা সম্পর্কে লোচন দাস বলেছেন—

বিষ্ণুপ্রিয়া-হিয়া-মাঝে আনন্দ হিল্লোল।
ধরিতে না পারে অঙ্গ-সুখের নাহি ওর ॥

গৌরাঙ্গদেব গয়া থেকে ফিরে এলেন বটে কিন্তু তাঁর মধ্যে সবাই এক অদ্ভুত ভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। সাময়িক ঘোর কাটাবার পর আত্মীয় পরিজন বুঝলেন, "প্রভুর অপূর্ব পরিবর্তন হইয়াছে। তিনি গয়াধামে গমন করিবার পূর্বে একরূপ ছিলেন, আর যখন সেখান হইতে ফিরিলেন তখন ঠিক অন্যরূপ। যেন সেই নিমাই চাঁদ নহেন" [বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত]। মুখের হাসি উধাও। মনের মধ্যে নেই কোন উৎসাহ। প্রাণে নেই কোনও আনন্দ। মুখে তাঁর কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণপ্রেমে তাঁর হৃদয় উথাল-পাথাল। কখনও কৃষ্ণপ্রেমে অঝোরে কাঁদছেন, কখনও হুঙ্কার দিয়ে উঠছেন। পুত্রের এই প্রেমোন্মাদ অবস্থা শচীদেবীর ভাল লাগল না। তেমনি শঙ্কিতা হয়ে উঠলেন বিষ্ণু-প্রিয়াও। কেননা পাণ্ডিত্য বাদ দিয়ে গৌরাঙ্গদেবের এই অবস্থার পরিচয় আগে

কেউ দেখেননি। তাই সরলা বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া এ সবের কিছুই অনুধাবন করে উঠতে পারছেন না। স্বাভাবিকভাবেই তিনি শাশুড়ির কাছে স্বামীর কোন রোগ হয়েছে কিনা এমন আশংকা প্রকাশ করলেন। শচীমাতাও গৃহদেবতা নারায়ণের কাছে পুত্রের এই অবস্থা বিহিত করার প্রার্থনা জানালেন। কিন্তু নিমাই কৃষ্ণপ্রেমে একই রকম আত্মহারা। এ সময়ে গৌরাঙ্গদেব মাঝে মাঝেই ভাববিহ্বল হয়ে "ধূলোয় লুটিয়ে শচীমাকে প্রণাম করেন। বলেন—শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে আলিঙ্গণ করেন—যেন তিনি শ্যামমনোহরকেই আলিঙ্গন করছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়ার সারা শরীর থর থর করে কেঁপে ওঠে। শিহরণ জাগে, তাঁর শরীরে।" [পরমা প্রকৃতি বিষ্ণুপ্রিয়া]।

গৌরাঙ্গদেবের এই পরিবর্তিতরূপ শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিষণ্ন করে তুলেছে দিন দিন। আসলে গয়াতে শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের ফলেই যে এমন বৈরাগ্যভাবের উদয় হয়েছে তা কেউ-ই উপলব্ধি করতে পারলেন না। অথচ যতদিন যাচ্ছে গৌরাঙ্গদেবের প্রেমোন্মাদনা ততই বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে সংসারের প্রতি বৈরাগ্যের ভাব। অতিপ্রিয় অধ্যাপনার ক্ষেত্রেও অনাগ্রহী হয়ে পড়েছেন তিনি। শিক্ষকের সেই মনোভাব আর নেই। পাঠদানের পরিবর্তে—

একদিন সব শিষ্যগণে গৌরহরি।
বলিল সবারে প্রভু অনুগ্রহ করি॥
পড় এক সত্য বস্তু—কৃষ্ণের চরণ।
সেই বিদ্যা যাতে হরিভক্তির লক্ষণ॥
তাহা বিনু আর সব অবিদ্যা—শাস্ত্রে কহে।
রাধাকৃষ্ণ—ভক্তি বিনা কেহো সঙ্গী নহে॥ ৪॥
বিদ্যা-কুল-ধন-মদে কৃষ্ণ নাহি পায়।
ভক্তিতে সে অনায়াসে পাই যদুরায়॥
ভক্তিরসে বশ কৃষ্ণ—দেখহ বিচারি।
এত কহি শ্লোক পড়ে শাস্ত্র—অনুসারি॥ ৫॥

[চৈতন্যমঙ্গল—লোচনদাস]

গৌরাঙ্গদেবের এই অদ্ভুত আচরণের ফলে মাতা শচীদেবী যেমন অসহায় হয়ে পড়েছিলেন, ততোধিক অসহায় অবস্থা হয়েছিল বিষ্ণুপ্রিয়ার। বিষ্ণুপ্রিয়ার

সেই কৈশোর ও যৌবন সন্ধিক্ষণের বয়সে পতিকে নিয়ে যেভাবে উন্মনা হওয়া স্বাভাবিক ছিল, গৌরাঙ্গদেবের আচরণ তো তার সম্পূর্ণ বিপরীত। বরং গৌরাঙ্গদেবের আচরণে বালিকা বধূটি চূড়ান্ত ভীত হয়ে পড়েছিলেন। ভারতের সাধিকায় দেখি—"বিষ্ণুপ্রিয়া আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। এ কি অদ্ভুত পরিবর্তন তাঁর স্বামীর? তবে কি এ দিব্যোন্মাদের অবস্থা? অথবা উন্মাদ রোগ? যে স্বামীর হাতে হাত সঁপে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে সংসার জীবন তিনি শুরু করেছিলেন, সে যেন আজ কত দূরে ধরা ছোঁয়ার বাইরে, কোন্ অজানা লোকের দিকে ক্রমে সরে সরে যাচ্ছে।"

আর তাই পুত্র নিমাইকে সংসারে আকৃষ্ট করবার জন্য শচীমাতা যখন বিষ্ণুপ্রিয়াকে সাজিয়ে পুত্রের সামনে বসাতেন তখন গৌরাঙ্গদেবের কৃষ্ণহুঙ্কার শুনে বিষ্ণুপ্রিয়া পালিয়ে যেতেন। প্রতিনিয়ত বিরহযাতনায় অসহায় বাণ-বিদ্ধ কপোতীর মত শুধু দগ্ধ হতেই থাকতেন। একটি ছোট সুখী সংসারের মাত্র তিনটি প্রাণী-শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া ও গৌরাঙ্গদেবের এই সময়কার অবস্থার জীবন্ত রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস।

পূর্ব্ব-বিদ্যা-ঔদ্ধত্য না দেখে কোন জন।
পরম বিরক্ত প্রায় থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥ ১৩৩ ॥
পুত্রের চরিত্র শচী কিছুই না বুঝে।
পুত্রের মঙ্গল লাগি' গঙ্গা-বিষ্ণু পূজে ॥ ১৩৪ ॥
"স্বামী নিলা কৃষ্ণচন্দ্র! নিলা পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সবে-মাত্র আছে একজন ॥ ১৩৫ ॥
অনাথিনী মোরে, কৃষ্ণ! এই দেহ' বর।
সুস্থ চিত্তে গৃহে মোর রহু বিশ্বম্ভর ॥ ১৩৬ ॥
লক্ষ্মীরে আনিয়া পুত্র-সমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায় ॥ ১৩৭ ॥
নিরবধি শ্লোক পড়ি' করয়ে রোদন।
"কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!" বলে অনুক্ষণ ॥ ১৩৮ ॥
কখনো কখনো যেবা হুঙ্কার করয়।
ডরে পলায়েন লক্ষ্মী, শচী পায় ভয় ॥ ১৩৯ ॥

শচীদেবীর আপ্রাণ চেষ্টা বিফলেই যায় এমন অবস্থা। স্বামীর মন ফেরাতে নিদারুণভাবেই ব্যর্থ হন বিষ্ণুপ্রিয়া।

হরিদাস গোস্বামী চৈতন্য চরিতকারদের সঙ্গে একমত। বিষ্ণুপ্রিয়া চরিতে

তাঁদের কথাকেই সমর্থন করে তিনিও নিজ বক্তব্যে জানিয়েছেন, মাতা ও পত্নীর যে বিরহদশা শুরু হয়েছে তা গৌরাঙ্গ প্রভু শুরুতেই বিলক্ষণ জানতেন ও বুঝতেন। "জননী ও শ্রীমতীর মনের অবস্থা তিনি সকলই বুঝিতে পারিতেছেন। তিনি অন্তর্যামী ভগবান। তাঁহার অগোচর কিছুই নাই। মায়াময়ের মায়ায় জননী অভিভূতা। সকলই লীলাময়ের লীলা। কৌশলীর কৌশলজালে সকলেই আচ্ছন্ন। মহাচক্রীর চক্রে পড়িয়া শচীদেবী ও শ্রীমতী ব্যতিব্যস্ত ও ত্রস্ত।"

চৈতন্যভাগবতে দেখি তাই একদিন গৌরাঙ্গদেব মাতাকে কৌশলে তত্ত্বকথা শোনালেন।

"শুন শুন, মাতা! কৃষ্ণভক্তির প্রভাব।
সর্ব্বভাবে কর মাতা! কৃষ্ণে অনুরাগ ॥ ১৯৯ ॥
কৃষ্ণ সেবকের মাতা! কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস ॥ ২০০ ॥
গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক, মাতা, কিছুই না জানে ॥ ২০১ ॥
জগতের পিতা—কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ ॥ ২০১ ॥

মাতা শচীদেবীকে তত্ত্বকথা শোনানোর মাধ্যমে একদিকে গৌরাঙ্গদেব কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য বর্ণনা করলেন। অন্যদিকে তেমনি গর্ভস্থ জীবের আত্মজ্ঞান, পূর্বজন্মকৃত নিজ পাপক্ষয়ের জন্য অনুতাপ এবং গর্ভাবস্থায় স্থিতিকালে জীবের ঈশ্বর জ্ঞান এবং গর্ভযন্ত্রণা নিবারণের জন্য কৃষ্ণ আরাধনা ও স্তব—এইসব অতিসূক্ষ্ম তত্ত্বগুলিও ব্যাখ্যা করলেন।

আসলে মাতাকে এই তত্ত্বজ্ঞান ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি মাতা-পুত্রের অদূরেই বসে থাকা পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকেও তিনি তত্ত্বশিক্ষা দিয়েছিলেন। আসলে গৌরাঙ্গদেব মনে মনে নিজের পথ ঠিক করেই ফেলেছিলেন। আর তাই নিজ ঘরণীর ভবিষ্যতে চলার পথটি নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যেই তত্ত্বব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই তত্ত্বব্যাখ্যার মাধ্যমেই প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ধর্ম শিক্ষার সূচনা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এ সময় গৌরাঙ্গদেব সহধর্মিনী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে নির্দ্ধিধায় দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে দীক্ষাদানও করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য বিষ্ণুপ্রিয়া-ভ্রাতা যাদব আচার্যকেও তিনি দীক্ষাদান করেছিলেন। "শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব দীপিকা"র গ্রন্থকার নবদ্বীপ নিবাসী, মাধবাচার্যের

বংশধর শ্রীযুক্ত শশীভূষণ গোস্বামী ভাগবতরত্ন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মন্ত্ররহস্য কথা উক্ত গ্রন্থোক্ত এবং প্রামাণ্য।—

'দীক্ষিতা প্রভুনা তেন পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বয়ং।
সিদ্ধিমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েত ॥
ইতি শাস্ত্রবলাদ্ধেতোঃ স্বভার্য্যামুপদিষ্টবান্।
অথ ত্বং যাদবাচার্য্যং সর্ব্বেষাং নঃ পরং গুরুং ॥'

শুধু মাতা-পত্নী ও পড়ুয়া ছাত্রদের-কেই গৌরাঙ্গদেব কৃষ্ণকথা শোনালেন তাই নয়, কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবদের মাঝে তিনি পরম বৈষ্ণবও সাজলেন। গৌরাঙ্গদেবের এই নতুন অবস্থা দেখে বৈষ্ণব ভক্তদের মনে আশার সঞ্চার হল। তারা দল বেঁধে গৌরাঙ্গদেবের কাছে এসে পাষণ্ডীদের নামে নালিশ করতে থাকেন। পাষণ্ডীদের অত্যাচারে লাঞ্ছিত বৈষ্ণবেরা দুঃখের মাঝেও উল্লসিত হৃদয়ে গৌরাঙ্গদেবের কাছে তাদের দুঃখময় জীবনের কথা বর্ণনা করে যান। সব শুনে কৃষ্ণনামে আত্মহারা গৌরাঙ্গদেব ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে বলেছেন:

আপনে ভক্তের দুঃখ শুনিয়া ঠাকুর।
পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাড়িল প্রচুর ॥ ৮৫ ॥
"সংহারিমু সব" বলি' করয়ে হুঙ্কার।
"মুঞি সেই, মুঞি সেই" বলে বার বার ॥
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়।
লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায় ॥ ৮৭ ॥
এই মত হৈলা প্রভু বৈষ্ণব—আবেশ।
শচী না বুঝয়ে কোন্ ব্যাধি বা বিশেষ ॥ ৮৮ ॥
স্নেহ বিনু শচী কিছু নাহি জানে আর।
সবারে কহেন বিশ্বম্ভরের শুভার ॥ ৮৯ ॥
"বিধবা যে স্বামী নিল, নিল পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন ॥ ৯০ ॥
তাহারো কিরূপ মতি, বুঝন না যায়।
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায় ॥ ৯১ ॥
আপনে-আপনে কহে মনে মনে কথা।
ক্ষণে বলে,—ছিণ্ডোঁ ছিণ্ডোঁ পাষণ্ডীর মাথা ॥ ৯২ ॥
ক্ষণে গিয়া গাছের উপর-ডালে চড়ে।

না মেলে লোচন, ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে ।। ৯৩ ।।
দন্ত কড়মড় করে, মালসাট মারে ।
গড়াগড়ি যায়, কিছু বচন না স্ফুরে ।। ৯৪ ।।

গৌরবক্ষ বিলাসিনী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দিনগুলি কাটছিল স্বামীর এই অষ্টসাত্ত্বিক প্রেমবিকার গ্রস্তরূপ দর্শন করে। সাধারণ প্রতিবেশীরা এ'সবের অর্থ বুঝত না। তারা চিন্তিত শাশুড়ী-বধূকে উপায় বাতলে দিত। বলত, এ হচ্ছে বায়ু রোগ। চিকিৎসার পদ্ধতিও তারা জানিয়ে দিত। শচীমাতা বাৎসল্যভরে যে যা বলত তাই করতেন পুত্রকে সুস্থির করার জন্য। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও স্বামীকে স্বাভাবিক অবস্থায় পাবার জন্য শাশুড়িকে ওষুধ-পথ্য ঠিকমত যোগান দিয়ে সাহায্য করতেন।

স্বভাবতই উক্ত কারণে যৌবনে উত্তীর্ণা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কাছে স্বামীসঙ্গ পাবার বিশেষ সুযোগ একদমই হচ্ছিল না। কখনও সুখে কখনও দুঃখে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দিন কেটে যাচ্ছিল। এর ওপর এই সময় থেকে গৌরাঙ্গদেব আবার বাড়িতে রাতে অনিয়মিত আসা শুরু করলেন। কারণ অধিকাংশ সময়ই তিনি কীর্তন করতে করতে হরিবাসরেই নিশি যাপন করতেন। আর যদিও বা বাড়িতে আসতেন তবে অধিকাংশ সময়ই কৃষ্ণ প্রেমকথা আলোচনা করে সময় কাটিয়ে দিতেন। তাঁর এ সময়কার অবস্থা—

মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর প্রতি দিনে দিনে।
সংকীর্তন করে সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সনে ।। ১৫৯ ।।
সর্ব্ব-অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি ক্ষণে-ক্ষণে হয়।
ক্ষণে হয় সেই অঙ্গ নবনীতময় ।। ১৬৭ ।।
অপূর্ব্ব দেখিয়া সব—ভাগবত গণে।
নর-জ্ঞান আর কেহ না করয়ে মনে ।। ১৬৮ ।। [ঐ]

অবশ্য এই সময় কখনও কখনও গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল মিলন যে একেবারেই হত না তা নয়। বরং দুঃখিনী মায়ের কিঞ্চিৎ সুখের জন্য মাঝে মাঝে গৌরাঙ্গদেব স্বাভাবিভাবেই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সঙ্গে মিলিত হতেন।

একদিন নিজগৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বসি' আছে লক্ষ্মী সঙ্গে পরম সুন্দর ।। ৬৫ ।
যোগায় তাম্বুল লক্ষ্মী পরম হরিষে।
প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রাত্রি দিশে ।। ৬৬ ।।
যখন থাকয়ে লক্ষ্মী সঙ্গে বিশ্বম্ভর।

শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর ।। ৬৭ ।।
মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া ।
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া ।। ৬৮ ।। [ঐ]

মাঝে মাঝে স্বামী সাহচর্য পেলেও এই সময় বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতেন। তাঁর এই যন্ত্রণার উৎস স্বামীর প্রতি অভিমান। আবার স্বামীকে তা সময় সুযোগ মত খুলে বলতেও সাহস পেতেন না। এখন আর তিনি নিছক বালিকা নন। স্বাভাবিকভাবেই স্বামী-সঙ্গ সুখ-লালসা তার মনে উদয় হয়েছে। অথচ গৌরাঙ্গদেবের এইদিকে আর কখনই খেয়াল হত না! অধিকাংশ রাত কীর্তনে বাইরে ব্যস্ত থাকার ফলে যখন তিনি বাড়িতে ফিরতেন, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অভিমান মাখানো সরল মুখখানার দিকে তাকিয়ে তিনি কৃষ্ণকথাকে এমনভাবে আশ্রয় করতেন যে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্বামীর রূপ দেখে, ভাব দেখে পরিস্থিতিকে সামলে নিতেন, মানিয়ে নিতেন। এই সময় একদিন গৌরাঙ্গদেবের মেসোমশাই চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে কৃষ্ণযাত্রায় রাধাবেশে গৌরাঙ্গদেব এক অপরূপ মহিমা প্রকাশ করেছিলেন। যাত্রার দর্শকাসনে সখি পরিবেষ্টিতা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্বামীর এই রাধারূপ দেখেমনে মনে এক অপার আনন্দ অনুভব করেছিলেন।

শচীদেবী এরূপ অবস্থার মাঝেও পুত্রকে গৃহের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তাঁর কৃত চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখতেন না। তিনি নিজে রান্না করে খাবার গুছিয়ে বিধুমাতাকেই বলতেন পরিবেশন করতে। আর নিজে পুত্রের খাওয়া নিরীক্ষণ করতেন তীক্ষ্ণ চোখে। মাঝে মাঝে গৌরাঙ্গদেবের মন ভালো থাকলে শচীমাতা ঘরের পরিবেশকে হাসি খুশিতে আবার ভরিয়ে তোলার জন্য ভোজন রসিক গৌরাঙ্গদেবকে ভোজনে বসিয়েনানা গল্প কথার অবতারণা করতেন। এমনই একদিন শচীমাতা তাঁর দেখা একটি অদ্ভুত স্বপ্নের কথা গৌরাঙ্গদেবকে শোনালেন। স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে গৌরাঙ্গদেব অদ্ভুত রসিকতা করে জননীর সন্তুষ্টি বিধান করলেন। তিনি বললেন, ঠাকুর ঘরের নৈবেদ্য তাহলে তোমার ওই স্বপ্নে দেখা রাম-কৃষ্ণ-রাই খেয়ে যান। আমি ভাবি, তোমার বধূটির-ই এ কর্ম। শচীমাতার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ও গৌরাঙ্গদেবের রসিকতায় বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর হাসি পেয়ে যায়। তিনি দ্বারের অন্তরালে বসে মাতা পুত্রের সমস্ত কথা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শোনেন।

হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা স্বামীর বচনে
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্ন কথা শুনে ।। [চৈতন্য ভাগবত]

মাতা-পত্নীকে আশ্বস্ত করার জন্য গৌরাঙ্গদেব যতই সংসারলীলায় নিবিষ্ট হবার চেষ্টা করুন না কেন তা যে খুবই ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর তা তাঁর মত ভাল আর কেউই জানেন না।

এই সময়ে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর রূপ কেমনহয়েছিল তা নিয়ে একটি পদ রচনা করেছেন শ্রীল শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর। তাঁর রচিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলামৃত' কাব্যটির পয়ারছন্দে অনুবাদ করেছেন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ। অনুবাদ অংশটি তুলে ধরা হল।

কনক দামিনী জিনি অঙ্গের বরণ।
কত কোটি চাঁদ শোভা সুচারু বদন॥
বেণী ভুজঙ্গিনী শোভে নিতম্ব উপরে।
গ্রন্থিত কনক ঝাঁপ বকুলের হারে॥
কুটিল কুণ্ডল যেন ভ্রমরের পাঁতি।
দুই গণ্ড ঝলমল মুকুরের ভাঁতি॥
কর্ণে সাজে মণিময় কর্ণিকা ভূষণ।
নিম্নে দোলে ক্ষুদ্র ঝাঁপা মুকুতা খিচন॥
কর্ণ ভূষা ভার ভয়ে সুবর্ণ শিকলে।
শলাকা সহিতে বন্ধ করি শ্রুতিমূলে॥
স্বর্ণসূত্রে সূক্ষ্ম মুক্তা করিয়া রচন।
পদ্মরাগ মণি মাঝে সিঁথার বন্ধন॥
কপালে সিন্দুর বিন্দু প্রভাতে অরুণ।
কস্তুরী চিত্রিত তার পাশে সুশোভন॥
মৃগমদ বিন্দু শোভে চিবুক উপরে।
সুরঙ্গ অধরে মৃদু হাস মনোহরে॥
চকিত চাহনি যেন চঞ্চল খঞ্জন।
ভুরুর ভঙ্গিমা দেখি কাঁপয়ে মদন॥
তিলফুল জিনি নাসা গজমুক্তা দোলে।
গলে চন্দ্রহার তহি মালতীর মালে॥
ছোট বড় ক্রম করি সুবর্ণের হারে।
কণ্ঠদেশে শোভা করিয়াছে থরে থরে॥
কুচযুগ শোভা স্বর্ণ-কলস জিনিয়া।
কনক চম্পক কলি উপরে বেড়িয়া॥

চন্দনের পত্রাবলী তাহাতে লিখন।
গজমতি হারে মণি চতুষ্কি শোভন॥
সুবর্ণ মৃণাল—ভুজযুগের বলন।
শঙ্খমণি কঙ্কনাদি তাহে বিভূষণ॥
বাজুবন্ধ বলিয়া বন্ধন ভুজমূলে।
তহি বন্ধ পট্ট আদি স্বর্ণ ঝাঁপা দোলে॥
রাঙ্গা করতলাঙ্গুলি মুদ্রিকা মণ্ডিত।
তর্জ্জনীতে শোভে হেম মুকুরে জড়িত॥
পরিধান শোভে দিব্য পট্ট মেঘাম্বরে।
অঞ্চল নির্ম্মাণ মণি মুকুতা ঝালরে॥
শুরুয়া নিতম্ব আর ক্ষীণ মধ্যদেশে।
কিঙ্কিনী রসনামণি তাহাতে বিলাসে॥
রাতুল চরণযুগ যাবক মণ্ডিত।
বঙ্করাজ রতন নূপুর বিভূষিত॥
মধুর গমন গতি হংসরাজ জিনি।
চটক গুঞ্জায়ে যেন নূপুরের ধ্বনি॥
নবনীত জিনিয়া কোমল তনুখানি।
হাস পরিহাসে রত দিবস রজনী॥

[বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত থেকে সংগৃহীত]

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর রূপ যৌবনের ছটায় দিশ্বিদিক যখন মোহিত সেসময় গৌরাঙ্গদেবের কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদ দশা এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তিনি একদিন মুরারির কাছে প্রকাশ করে বসলেন তাঁর বৃন্দাবন যাবার ইচ্ছার কথা। প্রবলভাবে বাধা দিলেন মুরারি। তিনি গৌরাঙ্গদেবকে বোঝালেন, এ অসময়ে তিনি যদি বৃন্দাবনে গমন করেন তাহলে তাঁর ভক্তদের তথা বৈষ্ণব সমাজের প্রচুর ক্ষতি হয়ে যাবে। নরম মনে গৌরাঙ্গদেব মেনে নিলেন মুরারির প্রস্তাব। চৈতন্যমঙ্গলে এর সমর্থন দেখি ঃ

এ বোল শুনিয়া প্রভু নিশবদে রহি।
খণ্ডিবারে নারিল মুরারি যত কহি॥
তবে আর কত দিন রহিলা কৌতুকে।
নয়ন ভরিয়া দেখে নদীয়ার লোকে॥

জননীর হৃদয় নয়ন স্নিগ্ধ করি।
বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গে ক্রীড়া করে গৌরহরি॥

[লোচন দাস]

দুরন্ত যৌবনা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এক সময়ে শুনলেন স্বামী বৃন্দাবন যেতে চান। বজ্রাঘাত-সম এ বৃত্তান্ত তাঁর কর্ণগোচর হল ভক্তবৃন্দ মারফত। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। মনে মনে হিসেব করেন, এই'ত সেদিন গৌরাঙ্গ-দেব গয়া থেকে ফিরলেন বটে, কিন্তু কত পাল্টে গেছেন তিনি। গৌরাঙ্গবল্লভার সাধ-আহ্লাদ, স্বপ্ন সবই যে ভেঙে চুরমার হবার যোগাড়। আশঙ্কিত চিত্তে ভাবেন, এবার যদি বৃন্দাবনে গিয়ে আর না ফেরেন? নিজেকে খানিকটা হাল্‌কা করতে সখিদের কাছে মনোবেদনা প্রকাশ না করে পারেন না তিনি। শুধুই অমঙ্গল চিন্তা তাঁর। পদকর্তা বাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা মাধব ঘোষের পদাবলীতে—

বিষ্ণুপ্রিয়া সখিসঙ্গে কহে ধীরে ধীরে।
আজ কেন প্রাণ মোর সদাই অস্থিরে॥
স্ফুরয়ে দক্ষিণ আঁখি কেন স্ফুরে অঙ্গ।
না জানি বিধি কি করয়ে-ছল রঙ্গ॥
আর যত অকুশল স্ফুরয়ে সদাই।
মরমক বেদনা শত অবগাই॥
আরে সখি পাছে মোর গৌরাঙ্গ ছাড়িব।
মাধব এমন হইলে অনলে পশিব॥

নিজের বিধিলিপির দোষ দিচ্ছেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। এরই মাঝে আরও বিপদ ঘনিয়ে এল নবদ্বীপের বুকে। সন্ন্যাসী কেশবভারতী এসেছেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে, গৌরাঙ্গদেবের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেছেন তিনি। নিভৃতে গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে অনেক গুহ্য কথাও আলোচনা হয়েছে তাঁর। এ সমস্তই সুতীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করেছেন শচীমাতা। তাঁর অনুসন্ধানী চোখ এড়ায়নি কিছুই। বধূমাতার কথাই শুধু মনে পড়ছে তাঁর। এমন অসময়ে বিষ্ণু-প্রিয়াদেবী রয়েছেন পিত্রালয়ে। তাঁর কানে এ কু-সংবাদ পৌঁছয়নি। বৃন্দাবন যাত্রার কথা শোনামাত্রই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী মনের যন্ত্রণায় অর্ধমৃত হয়ে আছেন। কেশব ভারতী ও গৌরাঙ্গদেবের নিভৃত আলাপের ভয়ঙ্কর দৃশ্য বধূমাতা চোখে দেখলে কি বিপদটাই না ঘটে যেত ভাবেন শচীমাতা। যতই ডাগর ডোগর দেখতে হোকনা কেন একেবারেই যে কাঁচ মেয়ে

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। এদিকে গৌরাঙ্গদেব কেশব ভারতীকে দেখে মনে মনে ভাবছেন—

তোমার মত বেশ আমি কবে সে ধরিব।
কৃষ্ণের উদ্দেশে মুঞি দেশে দেশে যাব ॥

গৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসের সূত্রপাত এখান থেকেই। তিনি মনে মনে স্থির করেই নিলেন যে আর গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকবেন না। সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করবেন। এদিকে গৌরাঙ্গদেবের কৃষ্ণপ্রেম যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে পিত্রালয়ে বসে অহরহ সেকথা ভেবে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মনে ক্রমশঃ শঙ্কাই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তিনিও মনে মনে বুঝে নিয়েছিলেন স্বামীকে গার্হস্থ্য জীবনে আটকে রাখা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। গৌরাঙ্গদেবও তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের দৃঢ় সংকল্পের কথা আর মনের মধ্যে চেপে রাখতে পারলেন না। ঘনিষ্ঠজনদের একে একে জানিয়ে দিলেন যে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেনই এবং স্বভাবতঃই গৃহত্যাগও করবেন। একথা শুনে হাহাকার করে উঠলেন সব ভক্তবৃন্দ। মুকুন্দ, গদাধর, শ্রীবাস, মুরারি, হরিদাস গৌরাঙ্গদেবকে তাঁর সংকল্প ত্যাগ করবার জন্য আকুল প্রার্থনা জানালেন। গৌরাঙ্গদেব তাঁদের একত্রে কাছে ডেকে বোঝালেন :

লোকরক্ষা নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস।
এতেক তোমরা সব চিন্তা কর নাশ ॥

[চৈতন্য ভাগবত]

একটা বিষয় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ তা হল, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যখন পিত্রালয়ে রয়েছেন সেই সময় গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাসের প্রস্তাব দিলেন নিজ বাড়িতে বসে। তিনি যেন স্ত্রীর কথা ভুলেই গেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও যেন বাপের বাড়িতে গিয়েই গৌরাঙ্গদেবের এই ভাবনাকে আরও তরান্বিত ও সুচিন্তিত করে দিলেন। ঘুণাক্ষরে একবারও তিনি উদ্ভিন্ন যৌবনা স্ত্রীর কথা উচ্চারণও করলেন না। শিষ্যদের ভাবখানাও এমন যেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী অনেক আগেই সন্ন্যাস নিয়ে বসে আছেন। তাই যদি না হবে তাহলে ভক্তবৃন্দ যখন গৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের বাসনাকে মনের থেকে নির্মূল করার প্রচেষ্টায় নানা রকম যুক্তির অবতারণা করে ছিলেন, সেখানে শ্রেণী ভেদে ভক্তবৃন্দের অবস্থা,

শচীমায়ের দুঃখ, বৈষ্ণব সমাজের কথা সবই প্রাধান্য পেয়েছে কিন্তু একটি বারের জন্যও এ হেন সময়ে গৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস ধর্ম ভাঙ্গাবার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বাপের বাড়ি থেকে আনার কথা কেউ বললেন না কেন? গৃহত্যাগ করলে 'মাতৃবধে'-র ভাগী হবেন একথা বলা হলেও পরমা রূপসী পতি প্রাণা কোমল স্বভাবা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কথা কারও মনে পড়ল না এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? স্ত্রীবধেরও ভাগীদার হবেন না কি গৌরাঙ্গদেব? এর উত্তর দিয়েছেন হরিদাস গোস্বামী তাঁর 'বিষ্ণুপ্রিয়া চরিতে'। "আমার বোধ হয় এটী প্রভুরই লীলা। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলে স্ত্রীর মুখ দর্শন করিতে নাই। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের মন্ত্রণা কালে বোধহয় স্ত্রীর নাম করিতে নাই। তাই শ্রীমতীর নাম লয়েন নাই।" চৈতন্যমঙ্গলে বলা হয়েছে: গৌরাঙ্গদেব ঘোর বৈরাগ্যের প্রভাবে বলেছিলেন—

"অগ্নি হেন লাগে মোর সে হেন জননী।"

হরিদাস গোস্বামীর মতে গৌরাঙ্গদেব যে "শ্রীমতীর কথা কিছু বলেন নাই, ইহাতেই বুঝা যায়, শ্রীমতীর দুঃখের কথা তুলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস সংকল্প সভায় উপস্থিত ভগ্নহৃদয় ভক্তমণ্ডলীর প্রাণে আঘাত দেওয়া যুক্তি সিদ্ধ মনে করা হয় নাই।"

যেহেতু এই সময়ে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী পিতৃগৃহে ছিলেন, বাড়ির কেউ তাঁকে গৌরাঙ্গদেবের অভিপ্রায়ের এই হৃদয়বিদারক কথা না জানালেও লোকমুখে তিনি এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত প্রাণঘাতী সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলেন। সেজন্যই ভয়ানক চঞ্চল হয়ে তিনি ফিরে এসেছিলেন শ্বশুর গৃহে। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মানসিক অবস্থা তখন কি নিদারুণ তা সহজেই অনুমেয়।

কিছুটা অনুমানে এবং কিছুটা লোকমুখেই মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়া সংবাদ পেয়েছিলেন শচীমাতাও। আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখে যেমন দুর্বিপাকের আভাস পাওয়া যায় তেমনই অবস্থা তখন গোটা নবদ্বীপের। এমন সময় মেঘ না চাইতেই জলের মত ত্রস্তে ব্যস্তে গৃহে এসে পৌঁছুলেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। পুত্রবধূকে দেখে বজ্রপাতের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারালেন শচীদেবী। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সেবা-যত্নে সুস্থ করে তোলেন শাশুড়ি মাতাকে। এবার দু'জনের চোখাচোখি হতেই মেঘে মেঘে ঘর্ষণে আরেকটা বজ্রপাতের মত সংজ্ঞাহীনা হয়ে পড়লেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। লোচনদাস দুর্দান্ত ছবি এঁকেছেন এ সময়কার—

তবে দেবী শচীরাণী কহে মন কাহিনী,

হিয়া-দুখে-বিরস বদন।

মুখে না নিঃসরে বাণী, দু'নয়ানে ঝরে পানী,

দেখি বিষ্ণুপ্রিয়া অচেতন ॥

সুধাইতে নারে কথা, অন্তরে মরম-ব্যথা

লোকমুখে শুনি ঘানাঘুনা।

ইঙ্গিতে বুঝিল কাজ, পড়িল অকালে বাজ

চেতন হরিল সেই দীনা ॥

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অবস্থা দেখে ও লোকমুখের কানাকানিতে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে দিশেহারা অবস্থায় উন্মাদিনীর মতই প্রাণপ্রিয় নিমাই-র কাছে ছুটলেন শচীমাতা। পুত্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আকুলিত হৃদয়ে সন্ন্যাসের কথা কতটা সত্য তা যাচাই করতে চাইলেন। তাঁর মনে এমনিতেই দুঃখ, মাত্র ১৬ বছর বয়সে বড় পুত্র বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে চিরতরে চলে গেছেন। স্বামীর মৃত্যু, বড় পুত্রবধূ লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু সহ্য করে বুককে পাষাণে পরিণত করে ঘর আগলে থাকতে হয়েছে। কিন্তু এবার একি পরিণতির দিকে চলেছেন তিনি? আবার নয়নের মণি একমাত্র বংশধর ২৪ বছরের দুরন্ত যৌবনে সমৃদ্ধ নিমাই-র একি অভিলাষ? এর ওপর ঘরে ১৬ বছরের বিদ্যুৎচমক সুন্দরী যুবতী পুত্রবধূ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। তিনি নিজে ৬৭ বছরের বৃদ্ধা। বয়সের ভারে এবং উপর্যুপরি শোকে তাঁর পাষাণ শরীর এমনিই ভেঙে পড়েছিল। তার ওপর অন্ধের যষ্ঠিটি কিছুদিন ধরেই প্রতিটি মুহূর্ত তাঁকে শঙ্কার মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছেন। স্বাভাবিকভাবেই নিমাই-র চোখের দিকে তাকিয়ে সরাসরি তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যা শুনেছেন তা সব সত্যি কিনা? থমকে থাকেন তিনি নিজেই। নিমাই তো তাঁর কাছে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ যে তাঁর অনুমতি বিনা কোন সিদ্ধান্তই তিনি নেবেন না। পুত্রের মুখ দেখে এবার চমক ভাঙে শচীমাতার। সব কেমন জলের মত স্বচ্ছ হয়ে যায়। এবার তিনি সব বুঝে ফেলেছেন। তাই পুত্রকে একেবারে মোক্ষম বাণটি তিনি প্রয়োগ করলেন।

আগে ত মরিব আমি—পাছে বিষ্ণুপ্রিয়া।

মরিব ভকত সব বুক বিদারিয়া ॥ ৫৩২ ॥

[চৈতন্যমঙ্গল—লোচন দাস]

গৌরাঙ্গদেব কোন রকম ছল না করে স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করলেন নিজ অভিপ্রায়ের কথা। নিজেকে মায়ের অধম ও অযোগ্যপুত্র হিসেবে বিবেচিত করে বৃদ্ধা মায়ের ওপরই যুবতী স্ত্রীর দায়িত্বটি খুব সহজভাবে ছেড়ে দিলেন।

অবশ্যই গৌরাঙ্গদেব বুঝেছিলেন পরিণত বৃদ্ধা বৈষ্ণবী তাপসী মায়ের আঁচলই হচ্ছে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মাথার যোগ্য ছাউনি। এর তলায় আশ্রয় পেলেই এবং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে কৃষ্ণনামে শিক্ষিত করে তুলতে পারলেই একদিন ভবিষ্যৎ দেখবে চৈতন্যজীবনে ও চৈতন্যলীলায় এবং বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শুধুমাত্র পরিত্যক্তা স্ত্রী নন, মূর্তিমতী সাধনার প্রতীক হয়ে উঠবেন। আর তাই এ সময় গৌরাঙ্গদেবের মনে যে কথাগুলির উদয় হয়েছিল তা বলরাম দাসের পদাবলীতে সুন্দরভাবে স্থান পেয়েছে।

বৃথা পুত্র তোমার জন্মেছিলাম উদরে। ধ্রু।
হ'লো না হ'লো না (আমা হতে) প্রতিপালন তোমারে।
বিষ্ণুপ্রিয়া তোমার জ্বলন্ত আগুনি।
গৃহে রৈল সে হয়ে অনাথিনী।
বা যতন করে রেখো তারে
মা জননী গো!
তারে কৃষ্ণ নাম দিও শিক্ষে
এই আমার ভিক্ষে
মা জননী গো।

এত সহজেই আত্ম-সমর্পণ করতে রাজি নন শচীদেবী। পুত্রকে চেপে ধরলেন তিনি। দিলেন কিছু ধর্মোপদেশ। শোনালেন তত্ত্বকথা। বললেন অনেক নীতিশাস্ত্র। অবশেষে চরম বাস্তব সত্য কথাটি না বলে পারলেন না। একটি নাতি বা নাতনি চান তিনি পুত্রের কাছ থেকে। লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক—

পিতৃহীন পুত্র তুমি—দিল দুই বিহা।
অপত্য সন্ততি কিছু না দেখিল ইহা।।
তরুণ-বয়স নহে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম।
গৃহস্থ-আশ্রমে থাকি সাধ' সব কর্ম্ম।।
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ যৌবনে প্রবল।
সন্ন্যাস কেমনে তোর হইবে সফল।।

যৌবন ধর্মের সার কথা বলে সন্ন্যাসেচ্ছু পুত্রকে বজ্র আটুনিতে বেঁধেছেন মা। 'এবার 'গেরো'-তে ঢিলে দিতে হবে। তাই গৌরাঙ্গদেব চাইলেন মায়ের 'মায়া' দূর করতে। সব পথ ছেড়ে এবার তিনি 'মূল' পথে প্রবেশ করলেন। মাকে দান করলেন 'দিব্যজ্ঞান'। বলতে লাগলেন—

কে তুমি তোমার পুত্র কেবা কার বাপ।
মিছা তোর মোর করি কর অনুতাপ ॥ ৫৩৬ ॥
কি নারী পুরুষ কিবা কেবা কার পতি।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ বিনু নাহি আর গতি ॥
সেই মাতা সেই পিতা সেই বন্ধু জন।
সেই হর্ত্তা সেই কর্ত্তা সেই মাত্র ধন ॥
সেই সে কেবল গতি—কহিল এ তত্ত্ব।
তা বিনু সকল মিছা যতেক জগত ॥ ৫৩৭ ॥

... ...

সন্ন্যাস করিব কৃষ্ণ প্রেমার কারণে।
দেশে দেশে হৈতে আনি দিব প্রেম ধনে ॥

... ...

মনুষ্য-জনমে সবে কৃষ্ণ গুরু জানি।
সেই গুরু নাহি করে—পশু পক্ষী মানি ॥ [ঐ]

রূঢ় বাস্তবের জগত থেকে একেবারে অধ্যাত্ম জগতে ছিটকে গেলেন শচীমাতা। পুত্র বিশ্বম্ভরের মুখে ধর্মের এই তত্ত্বব্যাখ্যা শুনে তিনি বিমোহিত হয়ে গেলেন। চোখ মেলে দেখেন, কোথায় তাঁর পুত্র গৌরাঙ্গ? তাঁর পুত্রের জায়গায় তিনি যে শ্যাম-সুন্দরকে দেখতে পাচ্ছেন!

সেই ক্ষণে বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণবুদ্ধি হৈল।
আপন তনয় বলি মায়া দূরে গেল ॥ [ঐ]

শচীদেবী মনে মনে ভাবলেন জগতের দুর্লভতম জিনিস কৃষ্ণ, তিনিই পুত্ররূপে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। পৃথিবীতে আমার মত সৌভাগ্য-বতী রমণী আর কে আছে? সে ঈশ্বর আবার আমাকে 'মা' বলে ডাকে অহরহ। তিনি আর বেশি ভাবতে পারেন না। বিশ্বম্ভরের মুখের দিকে আবার, আবার, বারবার তাকান। দেখেন তাঁর সর্বাঙ্গ কৃষ্ণময়। কৃষ্ণ তাঁর কাছে সন্ন্যাসের জন্য অনুমতি চাইছেন? তিনি আজ অনুমতি দেবেন না তো কে অনুমতি দেবে? ভাবাবেশে তিনি ভাবেন এমন অনুমতি দেবার সৌভাগ্যই বা ক'জনের ভাগ্যে ঘটে? অবশেষে—

এত অনুমানি শচী কহিলা বচন।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষ রতন ॥ ৫৪৭ ॥

মোর ভাগ্যে এতদিন ছিলা মোর বশ।
এখনে আপন-সুখে করহ সন্ন্যাস ॥ [ঐ]

মায়ের কাছ থেকে অনুমতি আদায়ের পরই গৌরাঙ্গদেব শচীদেবীর দিব্য-জ্ঞান ফিরিয়ে নিলেন। পুনরায় সংসার মায়ায় অভিভূত হয়ে শচীদেবী দেখতে পেলেন তাঁর সামনে তো দাঁড়িয়ে আছে তাঁরই আত্মজ 'নিমাই'। কৃষ্ণ নেই। কেউ নেই। আনমনা হয়ে ভাবেন কিছুক্ষণ তাহলে এতক্ষণ তিনি কি দেখছিলেন? সংসার মায়াচ্ছন্ন শচীদেবী বুকফাটা হাহাকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

আমি কি বলিতে কি বলিলাম।
মা হ'য়ে নিমায়ে বিদায় দিলাম ॥ [ঐ]

এবার প্রকৃত ব্যথিত হৃদয়ে নিমাই জননীকে বুকে তুলে নিলেন। বললেন, তোমার কাছে কোন কথাই তো গোপন করিনি। আর তাছাড়া আমি তো এখনই সন্ন্যাস নিচ্ছি না। এখনও আমি কিছুদিন তোমাদের নিয়ে সুখে সংসার করতে চাই। তবে যাবার আগে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে না জানিয়ে যাব না। আর তখন আমায় দেখতে ইচ্ছে হলে—

যেদিন দেখিতে মোরে চাহ অনুরাগে।
সেই ক্ষণে তুমি আমা দেখিবারে পাবে ॥ [ঐ]

এই ভাবেই শচীদেবীকে আপাতঃ শান্ত করলেন গৌরাঙ্গদেব। এদিকে শ্বশুর বাড়িতে আসার পর মাতা-পুত্রের মধ্যে যে এত কাণ্ড ঘটে গিয়েছে তা ঘুণাক্ষরেও জানেন না বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। তাই তিনি শচীদেবীর কাছে উপযাচক হয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। শুধুই অপেক্ষা করে আছেন স্বামী সান্নিধ্যের দুর্লভ সময়টুকুর জন্য। প্রতিটি মুহূর্তই তিনি ভাবছেন, কখন প্রাণবল্লভের সাক্ষাৎ পাবেন। কখন মনের সমস্ত জমানো কথা উজাড় করে বলবেন। কাঙ্খিত সময় যথারীতি এসে গেল। দিন অবসানে গৌরাঙ্গদেব কিন্তু ঘরে আসতে বিলম্ব করলেন না। আজ আর তিনি বাইরে সংকীর্তনে যাবেন না। রাতের আহারাদি সেরে শোবার ঘরে গেলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী পানের বাটা হাতে নিয়ে স্বামীর কাছে গেলেন। অবাক বিস্ময়ে দেখলেন তিনি ঘুমিয়ে অচেতন। তাহলে জমে থাকা এত কথা জিজ্ঞাসা করবেন কিভাবে? প্রতিজ্ঞা করলেন স্বামীর ঘুম ভাঙাতেই হবে। তাই—

চরণ-কমল পাশে, নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে
নেহারয়ে কাতর-বয়ানে।

হৃদয় উপরে থুইয়া, বান্ধে ভুজলতা দিয়া,
প্রিয় প্রাণনাথের চরণে ॥ ৫৫১ ॥
দু' নয়নে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার চীর,
চরণ বহিয়া পড়ে ধারা।
চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্বিতে,
বিষ্ণুপ্রিয়ার পুছে অভিপারা ॥
মোর প্রাণপ্রিয়া তুমি কান্দ কেনে নাহি জানি,
কহ প্রিয়ে! ইহার উত্তরে।
থুইয়া উরুর পর চিবুকে দক্ষিণ কর,
পুছে কিছু মধুর অক্ষরে ॥ ৫৫২ ॥ [ঐ]

ব্যস্তভাবে উঠে বসলেন গৌরাঙ্গদেব। বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর প্রাণ-প্রিয়াকে। নিজের বসন দিয়ে মুছিয়ে দিলেন তাঁর চোখ। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী অবিরল ধারায় কেঁদে ভাসিয়ে দেন গৌরাঙ্গদেবের বুক। গৌরাঙ্গদেব অন্তর্যামী। বুঝতে পারেন তিনি সবই। আজই জননীকে তিনি একবার প্রবোধ দিয়েছেন। এবার স্ত্রীকে বোঝাতে হবে। স্ব-পথে আনতে হবে। প্রিয়াকে তিনি নিজ উরুর উপর তুলে বসালেন। ডান হাত দিয়ে তার মুখ তুলে ধরে মধুর বচনে বোঝাতে লাগলেন। প্রভুর প্রেমালাপ ও প্রেম পূর্ণ সম্ভাষণে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর হৃদয় মথিত হল। মনে সাহস আনলেন তিনি। যা শুনেছেন লোকমুখে তা কতটা সত্যি এবার জানতে হবে। গৌরাঙ্গদেবও অভিনয় ভালোই জানেন, এর আগে চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। আজও তিনি এমন একটা ভাব দেখালেন যেন শ্বশুর বাড়ি থেকে অনেকদিন পর প্রিয়া ফিরেছেন দেখে তিনি তাঁর সঙ্গ লালসায় খুবই ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন।

প্রভুর ব্যগ্রতা দেখি, বিষ্ণুপ্রিয়া চন্দ্রমুখী,
কহে কিছু গদ গদ স্বরে।
কহ কহ প্রাণনাথ, মোর শিরে দিয়া হাত,
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
লোক মুখে শুনি ইহা, বিদরিতে চাহে হিয়া,
আগুনিতে প্রবেশিব আমি ॥ ৫৫৪ ॥
তো লাগি জীবনধন রূপ নব-যৌবন,
বেশ-বিলাস ভাব কলা।

তুমি যবে ছাড়ি যাবে, কি কাজ এ ছার জীবে
হিয়া পোড়ে যেন বিষ-জ্বালা ॥ [ঐ]

ধৈর্য ধরে পত্নীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রেমালাপ শুনছেন গৌরাঙ্গদেব। মুখমণ্ডলের ওপরে ফুটিয়ে তুলেছেন সমবেদনার সুর। কিন্তু ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত হচ্ছেন পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দেবার। স্বামীকে নীরব থাকতে দেখে পূর্ণ সহানুভূতি ভেবে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এবার তাঁর সুখের সংসারের স্বপ্নের কথা, পরিকল্পনার কথা মনের আগল খুলে প্রকাশ করলেন। স্বামী ঘরে না থাকলে যে তাঁর মত সৌভাগ্যবতী রমণীর নবীন যৌবন ব্যর্থ হয়ে যায়।

আমা হেন ভাগ্যবতী, নাহি কোন যুবতী,
তুমি মোর প্রিয় প্রাণনাথ
বড় প্রীতি আশা ছিল, নিজ-দেহ সমর্পিল,
এ নব-যৌবনে দিবা হাত ॥ ৫৫৫ ॥ [ঐ]

আবেগে আত্মহারা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্বামীকে কিছুই বলার সুযোগ দিচ্ছেন না। সন্ন্যাস করলে স্বামীর সুকোমল চরণে পথ হাঁটার কষ্টের কথা উল্লেখ করলেন তিনি। এমনকি ধর্ম্মভয় পর্যন্ত দেখালেন। কারণ স্বামীর চরণ শরণাগতা স্ত্রীকে ত্যাগ করা অধর্মেরই সামিল। বৃদ্ধা মা, প্রিয়া-পরিজন, ভক্তদের কাঁদিয়ে সন্ন্যাস নিলে তা হবে আরও বড় অধর্ম্ম। স্বামীকে ঘরে রাখার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বললেন, আমাকে নিয়েই তোমার সংসার। আর আমিই তোমার পথের কাঁটা। তাহলে তো আমার মরণই ভালো। আমাকে তাহলে বিদায় দাও। তুমি জননী ও ভক্তদের নিয়ে ঘরে থাকো। স্বামীকে ঘরে রাখার জন্য প্রয়োজনে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত।

কি কহিব মুই ছার, মুই তোমার সংসার
সন্ন্যাস করিবে মোর ডরে।
তোমার নিছনি লৈয়া, মরি যাঙ, বিষ খাইয়া,
সুখে নিবসহ নিজ-ঘরে ॥ [ঐ]

সোহাগ, আলিঙ্গণের মাঝেও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জিজ্ঞাসা একটিই। গৌরাঙ্গদেবের উত্তরও মাত্র একটিই। কিন্তু বলতে বোঝাতে সময় লাগল অনেক। অবশেষে গৌরাঙ্গদেব অনুসরণ করলেন সেই পথ, মাকে যেভাবে বুঝিয়েছিলেন সেই একই পদ্ধতিতে তত্ত্বকথা শোনাতে লাগলেন এবার প্রেমময়ী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে—

মিছা সুত পতি নারী, পিতা মাতা আদি করি,
পরিণামে কেবা বা কাহার।

শ্রীকৃষ্ণ-চরণ বহি, আর ত কুটুম্ব নাহি,
যত দেখ—সব মায়া তার ॥

... ...

শ্রীকৃষ্ণ সবার পতি, আর সব প্রকৃতি,
এই কথা না বুঝয়ে কোই ॥ ৫৬৪ ॥ [ঐ]

এই কৃষ্ণকেই আশ্রয় করেছেন গৌরাঙ্গদেব। অতএব, স্বামীর উপযুক্ত স্ত্রী হিসেবে অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে সময় থাকতে স্বামীর পথ স্ত্রীকেও অবলম্বন করা উচিত। এভাবে কৃষ্ণ ভজনায় মন দেবার কথা বুঝিয়ে তিনি সহধর্মিনীর 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নামের যথার্থতা সম্পর্কে বললেন :

তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করহ ইহা,
মিছা শোক না করহ চিতে।
এ তোরে কহিলুঁ কথা, দূর কর আন চিন্তা,
মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে ॥ ৫৬৬ ॥ [ঐ]

এত সহজ করে বুঝিয়েও যখন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে ভোলানো গেল না তখন তিনি শেষ অস্ত্র হিসেবে ঐশ্বর্যের আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

আপনে ঈশ্বর হৈয়া, দূর করে নিজ-মায়া,
বিষ্ণুপ্রিয়া পরসন্নচিত।
দূরে গেল দুঃখশোক, আনন্দে ভরল বুক,
চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিত ॥ [ঐ]

পুত্রকে কৃষ্ণরূপে দেখে শচীমাতা তাঁকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্বামীকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী কৃষ্ণ হিসেবে সামনে দণ্ডায়মান দেখে খুশি হলেও পতি বুদ্ধি ছাড়েন নি। কৃষ্ণকেই স্বামী উদ্দেশ্য করে তিনি বলতে লাগলেন :

তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, চতুর্ভুজ দেখিয়া,
পতি-বুদ্ধি নাহি ছাড়ে প্রভু।
পড়িয়া চরণ-তলে, কাকুতি মিনতি করে,
এক নিবেদন শুন প্রভু ॥ ৫৬৭ ॥ [ঐ]

মুগ্ধ গৌরাঙ্গদেব। অবশেষে তিনি হেরেই গেলেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কাছে। এবার বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে স্ববশে আনতে মাধুর্যের আশ্রয় নিলেন। 'পরমা প্রকৃতি বিষ্ণুপ্রিয়া' থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক : "সহজ হয়ে এলেন প্রভু। ধরা দিলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে। প্রসন্ন চিত্তে [illegible]

তোমার পতিপ্রেম ও পতিভক্তি ধন্য। তুমি আমার জন্যে চতুর্ভুজধারী শ্রীশ্রীবিষ্ণুকেও উপেক্ষা করেছ। প্রিয়া, আমার হৃদয়ে তোমার আসন চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে। লোকে জানবে, আমি তোমায় ত্যাগ করে চলে গেছি। কিন্তু তুমি আমার অন্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে চিরকাল বিরাজমান থাকবে। তুমি যখনই আমায় ডাকবে আমি তখনই সাড়া দেব, দেখা দেব।"

লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলে আছে এর সমর্থন—

শুন দেবি বিষ্ণুপ্রিয়া, তোমারে কহিল ইহা,
যখনে যে তুমি মনে কর।
আমি যথা তথা যাই, আছিয়ে তোমার ঠাঁই,
এই সত্য কহিলাম দঢ়॥ [ঐ]

উভয়ের মধ্যে দৈহিক ও বাহ্যিক যে সম্পর্ক তা এতে লুপ্ত হবে ঠিকই কিন্তু উভয়ে উভয়ের অন্তরে সর্বদা বিরাজ থাকবেন। কৃষ্ণসত্তায় পৌঁছে মিলন সুখ সম্ভোগ করবেন। স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। শেষ পর্যন্ত তিনি যে স্বামীর আদেশ শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন সে কথারও ব্যাখ্যা দিতে ভোলেননি লোচন দাস।

প্রভু আজ্ঞাবাণী শুনি, বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গুণি,
স্বতন্ত্র ঈশ্বর এই প্রভু।
নিজ সুখে করে কাজ, কে দিবে তাহাতে বাধ
প্রত্যুত্তর না দিলেন প্রভু॥

গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস গ্রহণের আগে শেষবারের মত গার্হস্থ্য জীবনে মন দিলেন। সাংসারিক কাজে আগের থেকে অনেক বেশি সচেতন তিনি। বিষ্ণু-প্রিয়াদেবীর সঙ্গেও রসালাপে তাঁকে মগ্ন দেখা যায়। নতুনভাবে সংসার জীবনে আদর্শ তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন। অবশ্য "মাঝে মাঝে কৃষ্ণাবেশ ঘটে তাঁর অন্তরে, কৃষ্ণবেশে সজ্জিত করেন নিজের অনিন্দ্যসুন্দর দেহটি। বিশ্বম্ভরের এই মধুর ভাবটি বিষ্ণুপ্রিয়ার দুশ্চিন্তা ও আতঙ্ককে কিছু পরিমাণে হ্রাস করে। নটবর কৃষ্ণের মোহন বেশে স্বামীকে সানন্দে নিজ হস্তে তিনি সাজিয়ে দেন, ভাব বিহ্বল হৃদয়ে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকেন তাঁর দিকে, স্বর্গীয় আনন্দে দেহ মন প্রাণ স্পন্দিত হতে থাকে।" [ভারতের সাধিকা]

এ সময় গৌরাঙ্গদেব মাঝে মাঝে বৃন্দাবনলীলা প্রকাশ করতেন। তিনি ধবলী, শাওলী বলে গরুদের গোঠে ফেরার জন্য ডাকতেন। নিত্যানন্দ মুখ বাজিয়ে শিঙার শব্দ করতেন। লোকমুখে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ঘরে বসেই এ সমস্ত কথা শুনতে পেতেন। বাসু ঘোষ গৌরাঙ্গ লীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। গৌরাঙ্গদেব কীর্তন বাসরে যখন যেতেন তাঁর সাজসজ্জাও হত নটবর বেশী। কীর্তন বিশেষজ্ঞ বাসু ঘোষ এই রূপসজ্জা সম্পর্কে লিখেছেন—

চাঁচর চিকুর চূড়া চারু ভালে।
বেঢ়িয়াছে মালতীর মালে ॥ ৩২০৪ ॥
তাহে দিয়া ময়ূরের পাখা।
সপত্র-সহিত ফুলশাখা ॥ ৩২০৫ ॥
কষিত কাঞ্চন জিনি' অঙ্গ।
কটীমাঝে বসন সুরঙ্গ ॥ ৩২০৬ ॥
চন্দন-তিলেক শোভে ভালে।
আজানুলম্বিত বনমালে ॥ ৩২০৭ ॥
নটবরবেশ গোরাচাঁদ।
রমণীগণের কিবা ফাঁদ ॥ ৩২০৮ ॥
তা' দেখিয়া বাসুদেব কাঁদে।
প্রাণ মোর থির নাহি বাঁধে ॥ ৩২০৯ ॥

[ভক্তি রত্নাকর]

"নিজের গৃহেও এ সময়ে প্রভু একদিন ঐশ্বরীয় ঐশ্বর্য কিছুটা প্রকটিত করেন। উদ্দেশ্য, জননী শচীদেবীকে প্রত্যক্ষভাবে, আর পরোক্ষে জায়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে, তাঁর বর্তমানের ঐশ্বরীয় সত্তা—ঐশ্বরীয় জীবনের ভূমিকা সম্পর্কে একটু অবহিত করে রাখা।

নিত্যানন্দকে প্রভু সেদিন তাঁর গৃহে ভোজনের জন্য আহ্বান করেছেন···

উভয়ে খেতে বসেছেন, রান্নাঘর থেকে থরে থরে ভোজ্যদ্রব্য সব বিষ্ণুপ্রিয়া এগিয়ে দিচ্ছেন, আর জননী অপার সন্তোষে দুই ভায়ের পাতে তা ঢেলে দিচ্ছেন। সহসা শচী দর্শন করেন এক অপূর্ব অলৌকিক দৃশ্য। বিশ্বম্ভর যেন রূপান্তরিত হয়েছেন এক জ্যোতির্ময় শ্যামল দিব্য শ্রীমণ্ডিত দিব্য পুরুষরূপে। হস্তে তাঁর নানা আয়ুধ, আর তাঁর বক্ষস্থলে জ্যোতির্ময়ী দেবীরূপে বিরাজিত রয়েছেন বধূমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া। এ বিস্ময়ের দৈবী দৃশ্য দেখে ভাবাবেগে অধীর হয়ে পড়েন শচীদেবী, বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন ভূমিতলে।···

শচীমাতার মুখে এদিনকার দিব্য দর্শনের সব কথা শ্রবণ করেন বিষ্ণুপ্রিয়া। বার বার মনশ্চক্ষে তাঁর ভেসে উঠতে থাকে বিশ্বম্ভরের অলৌকিকী জ্যোতির্ময় মূর্তি। বার বার অন্তরে গুঞ্জরণ করতে থাকে শ্বশ্রূমাতার প্রশ্ন—"বৌমা, নিমাইর ঐ দিব্যমূর্তির বুকে আমি যে তোমার আলোয়-ভরা মূর্তিখানি দেখলাম? এ আবার কি রকমের দর্শন গো। বুঝতে পেরেছে তুমি কিছু?

লজ্জানত বিষ্ণুপ্রিয়া মাথা নেড়ে জানান, এ দিব্য দর্শনের তত্ত্ব তাঁর জানা নেই।

কিন্তু স্বামীর দিব্য জীবনের, অলৌকিকজীবনের সত্যতা সেদিন দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়ে গেল, বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরপটে। সেই সঙ্গে স্বামীর সহধর্মিনী-রূপে তাঁর নিজের একটা দৈবী ভূমিকা রয়েছে, সে তত্ত্বটিও উপলব্ধি করে-ছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া।" [ভারতের সাধিকা]।

আসলে বিদায়ের আগে সবাইকে বিষাদ থেকে মুক্ত করতে গৌরাঙ্গদেব এই নতুন জীবনের আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিছুদিন সুখে আনন্দে সকলকে মুগ্ধ করে রাখলেন তিনি। তখন শীতকাল। মাঘ মাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সকাল সকালই গঙ্গার উষ্ণ জলে স্নান সেরে পুজোর ঘরে ঢোকেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। তার পর রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হন। মাঘ মাসের উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন [ইং ১৫১০ খৃীঃ ফেব্রুয়ারি মাস] বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী রোজকার মতনই গঙ্গার স্নানে গেছেন। বাড়িতে ফিরলেন কাঁদতে কাঁদতে। চারিদিকে তিনি অমঙ্গল চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন। নাকের বেশর জলে পড়ে গেছে। বাসুদেবের পদে ঃ

পাগলিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ভিজা বস্ত্র চুলে।
ত্বরা করি বাড়ি আসি শাশুড়ীরে বলে ।।
বলিতে না পারে কিছু কাঁদিয়া ফাঁফর।
শচী বলে মাগো এত কি লাগি কাতর ।।
বিষ্ণুপ্রিয়া বলে আর কি কব জননী।
চারিদিকে অমঙ্গল কাঁপিছে পরাণি ।।
নাহিতে পড়িল জলে নাকের বেশর।
ভাঙ্গিবে কপাল মাথে পড়িবে বজর ।।
থাকি থাকি প্রাণ কাঁদে নাচে ডাহিন আঁখি।
দক্ষিণে ভুজঙ্গ যেন রহি রহি দেখি ।।

শচীমাতাও হন্তদন্ত হয়ে রান্নাঘর থেকে ছুটে আঙিনায় নেমে এসে

পুত্রবধূকে বুঝিয়ে, আশ্বস্ত করে দৈনন্দিন কর্মে নিয়োজিত করান। বউমাকে বলেন, শ্রীধর লাউ দিয়ে গেছে। নিমাই লাউয়ের পায়েশ খেতে চেয়েছে। তিনি তাই পায়েশ বানাতে ব্যস্ত।

কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সংসারের কোন কাজেই মন বসাতে পারেন না। অবিরলধারায় তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে যায়। আবার আরেক বিপত্তি ঘটিয়েছেন তিনি। গৃহকর্ম করতে গিয়ে কখন যেন তাঁর কানের সোনার দুলটিও পড়ে গেছে। নাকের বেশর হারিয়ে শাশুড়িকে জানিয়েছেন। দুল হারাবার সংবাদ তাঁর কানে তিনি তুলতে পারবেন না। তাই দ্বারস্থ হন সখীর। অমঙ্গল চিন্তার কথা তাকেও বলেন। বাসুদেবের পদাবলীতে দেখি—

বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গিনীরে পাইয়া বিরলে।
ব্যাকুল হিয়ায় গদগদ কিছু বলে ॥
আজি কেন নদীয়া উদাস লাগে মোরে।
অঙ্গে নাহি পাই সুখ দুটি আঁখি ঝুরে ॥
নাচিছে দক্ষিণ অঙ্গ দক্ষিণ নয়ন।
খসিয়া পড়িল মোর কর্ণের ভূষণ ॥
সুরধুনী পুলিনে মলিন তরুলতা।
ভ্রমর না খায় মধু শুকাইল পাতা ॥
স্থগিত হইল কেন জাহ্নবীর ধারা।
কোকিলের রব নাহি হৈল মূক পারা ॥

গৌরাঙ্গদেব যদি অন্তর্যামী ভগবান হন তাহলে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও অন্তর্যামিনী ভগবতী। তাই স্বামী সম্পর্কিত অমঙ্গল আশংকা সময় মতই তাঁর মনে উদিত হয়েছে। এদিকে গৌরাঙ্গদেবও তাঁর মনোগত ইচ্ছা নিত্যানন্দের কাছে প্রকাশ করে ফেলেছেন। চৈতন্যভাগবতকার সেকথা লিখেছেন—

শুন শুন নিত্যানন্দ—স্বরূপ গোসাঞি।
একথা ভাঙ্গিবে সবে পঞ্চ-জন ঠাঞি ॥ ৮ ॥
এই সংক্রমণ—উত্তরায়ণ—দিবসে।
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে ॥ ৯ ॥
'ইন্দ্রাণী' নিকটে কাটোঞা-নামে গ্রাম।
তথা আছে কেশব ভারতী শুদ্ধ নাম ॥ ১০ ॥
তান স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত।
এই পাঁচ জনে মাত্র করিয়া বিদিত ॥ ১১ ॥

আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, অপর মুকুন্দ॥" ১২॥
এই কথা নিত্যানন্দ-স্বরূপের স্থানে।
কহিলেন প্রভু, ইহা কেহ নাহি জানে॥

"এর পরে গৌর সুন্দর যে সন্ন্যাস-লীলা করেছেন তা বর্ণনা করতে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কোন স্থানে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর নাম উল্লেখ করেন নাই।"

[শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ চরিতাবলী, ত্রিদণ্ডী ভিক্ষু শ্রীভক্তিজীবন হরিজন]

অবশ্য বিদায়ের আগে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে মাধুর্যলীলায় মিলিত হয়েছিলেন গৌরাঙ্গদেব। চৈতন্যভাগবতে যদিও একথা স্বীকার করা হয়নি। বৃন্দাবন দাস বলেছেন চৈতন্যদেব সেদিন গদাধর ও হরিদাসকে নিয়ে শয়ন করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তো এ বিষয়ে মুখই খোলেননি। তিনি আদিলীলার পঞ্চদশ অধ্যায়ে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহলীলা বর্ণনা করেই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সম্পর্কিত আলোচনা থেকে নীরব থেকেছেন। এই যে লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলে সন্ন্যাসের রাত্রে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল মিলনের বিস্তৃত বর্ণনা আছে আর বৃন্দাবন দাস তা করেননি কেন? এখানে যুক্তি হল—

"শ্রীল লোচন দাসের শ্রীগৌরাঙ্গ, নবীন নাগর প্রেমময়, প্রেমদাতা, প্রাণকান্ত, জীবনধন। শ্রীলবৃন্দাবন দাসের শ্রীগৌরাঙ্গ, মহাপ্রভু, ঠাকুরের ঠাকুর, জগতের স্বামী পূর্ণব্রত সনাতন। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ালীলা মাধুর্য্য পূর্ণ, ইহার সহিত ঐশ্বর্য্য মিলাইলে লীলার মাধুর্য্যের হানি হয়।" [বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত]।

উল্লেখ পাওয়া যায়, বৃন্দাবন দাসের মাতা নারায়ণী দেবী সেই রাতে গৌরাঙ্গদেবের বাড়িতে থেকে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ালীলা দর্শন করেছিলেন। লোচন দাসের বর্ণনা সম্পর্কে বৃন্দাবন দাসের সংশয় ছিল। পুত্র বৃন্দাবনের এই সংশয় নারায়ণীদেবী সম্পূর্ণভাবে দূর করেছিলেন। তাছাড়া লোচনদাসের রচনায় স্বয়ং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সম্পূর্ণ অনুমোদন ছিল এ তথ্যও পাওয়া যায়। চৈতন্যমঙ্গলে লোচনদাস গৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের অর্থাৎ গৃহত্যাগের রাত্রের গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার বিদায়কালীন মদন উৎসবের পূর্ণাঙ্গ লীলা-মাধুরী বর্ণনা করেছেন।

"শ্রীল লোচনদাসকৃত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থখানি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রকটাবস্থায় লিখিত হয়; এ গ্রন্থ দেবী শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দিত হন, এই গ্রন্থ দেবীর অনুমোদিত। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আদেশ পাইয়া শ্রীল লোচনদাস তাঁহার গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজে প্রচার করেন।" [বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত]।

চৈতন্যমঙ্গলে বলা হয়েছে সেই রাতে গৌরাঙ্গদেবকে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী পা থেকে মাথা পর্যন্ত উপযুক্ত দ্রব্য দিয়ে মনের সাধে সাজিয়েছিলেন। শয্যাটি কেমন হয়েছিল তার সামান্য উদাহরণ দেওয়া যাক লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল থেকে—

শয়ন-মন্দিরে প্রভু শয়ন করিলা।
তাম্বুল-স্তবক-করে বিষ্ণুপ্রিয়া আইলা ॥
হাসিয়া সম্ভাষে প্রভু-আইস আইস বোলে।
পরম পিরীতি করি বসাইল কোলে ॥

এবার এহেন রসিক পতির কোলে বসে রসবতী রসিকা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সুগন্ধিযুক্ত তাম্বুল গৌরাঙ্গদেবের মুখে পুরে দিলেন। গৌরাঙ্গদেবও তাঁকে গভীর আলিঙ্গন দান করলেন। এবার বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী চন্দন, অগুরু, কস্তুরী প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে স্বামীর সর্বাঙ্গে উষ্ণ কোমল হাতে লেপন করলেন। সজ্জা পূর্ণাঙ্গ করতে শেষে, সখীদের সঙ্গে বসে রসালাপে সিক্ত স্বহস্তে গ্রন্থিত নানা রঙে রঞ্জিত ফুলমালা গলায় পরালেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভু-অঙ্গে চন্দন লেপিল।
অগুরু কস্তুরী গন্ধে তিলক রচিল ॥ ৫৮৩ ॥
দিব্য মালতীর মালা দিল গোরা-অঙ্গে।
শ্রীমুখে তাম্বুল তুলি দিল নানা-রঙ্গে ॥ [ঐ]

গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহের বাসর ঘর ও সন্ন্যাস গ্রহণের রাত্রির যে অবিশ্বাস্য লীলার বর্ণনা আমরা চৈতন্যমঙ্গলে দেখতে পাই তাকে ভক্তজনেরা রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা রূপেই দেখেছেন। সাধারণের আচরণের সঙ্গে এর কোন তুলনাই হতে পারে না। অনেক উঁচু মার্গের ঘটনাবলী এসব। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পতিদেবতাকে সাজানো শেষ হলেই গৌরাঙ্গদেবও পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে সাজাতে বসে গেলেন। যাবার আগে জগতকে শেষবারের মত একবার দেখিয়ে দিতে চাইলেন কোন কাজেই তিনি কারও থেকে কম যান না। প্রিয়ার দীর্ঘ কেশদাম দিয়ে সুন্দর কবরী রচনা করলেন। তাকে মন-মোহিনী করতে মালা গুঁজে দিতে ভুল হল না। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মুখচন্দ্র মুখোমুখি ঘুরিয়ে এনে কপালে এঁকে দিলেন সিঁদুরের টিপ, গণ্ডদেশ ও কপাল জুড়ে আঁকলেন চন্দন-সাজ, সারা অঙ্গে ও স্তনে অগুরু কস্তুরী কোমলভাবে ধীরে ধীরে লেপে দিলেন। যথোপযুক্ত স্থান ঠিক ঠিক অলঙ্কারে ভূষিত করলেন। ভুরুযুগল এঁকে দিলেন। সেই সঙ্গে চোখে পরালেন কাজল। পরিধান করালেন বহু

মূল্যবান পট্টবস্ত্র। বহু মূল্য রঙিন শাড়ি পরিধানে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে দেখে তাঁর মনে হল যেন রামধনু হাতের মুঠোয়। এবার তাঁর 'আজানুলম্বিত বাহু' দিয়ে ভুবনমোহিনী প্রিয়ার চোখে চোখ রেখে চেপে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলে—

তবে মহাপ্রভু সে রসিক-শিরোমণি।
বিষ্ণুপ্রিয়া-অঙ্গে বেশ করেন আপনি ॥
দীর্ঘকেশ কামের চামর জিনি আভা।
কবরী বান্ধিয়া দিল মালতীর গাভা ॥ ৫৮৪ ॥
মেঘ বন্ধ হৈল যেন চাঁদের কলাতে।
কিবা উগারিয়া গিলে না পারি বুঝিতে ॥
সুন্দর ললাটে দিল সিন্দূরের বিন্দু।
দিবাকর কোলে যেন রহিয়াছে ইন্দু ॥
সিন্দূরের চৌদিকে চন্দন বিন্দু আর।
শশি কোলে সূর্য্য যেন ধায় দেখিবার ॥ ৫৮৫ ॥
খঞ্জন-নয়ানে দিল অঞ্জনের রেখ।
ভুরু কাম—কামানের গুণ করিলেখ ॥
অগুরু কস্তুরী গন্ধ কুচোপরি লেপে।
দিব্য বস্ত্রে রচিল কাঁচুলি পরতেকে ॥
নানা অলঙ্কারে অঙ্গ ভূষিল তাহার।
তাম্বুল হাসির সঙ্গে বিহরে অপার ॥ ৫৮৬ ॥

"শেষ সংসার-খেলায় শ্রীগৌরাঙ্গ আজ মত্ত হয়ে উঠেছেন। প্রাণ উজাড় করে তাই প্রিয়ার অধর সুধা পান করছেন। থেকে থেকে বুকে জড়িয়ে ধরছেন। নানা রসে রসিয়ে তুলছেন তাঁকে এ যেন প্রতিটি অঙ্গের জন্য প্রতিটি অঙ্গের করুণ ক্রন্দন। জীবন বিলাপের বিলোল আকুতি। প্রিয়ার রূপ সাগরেও যেন আজ বান ডেকেছে।" [পরমা প্রকৃতি বিষ্ণুপ্রিয়া]

সোহাগ প্রেমালিঙ্গনে উভয়ে উভয়কে উপভোগ করতে লাগলেন। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে সুখ নিদ্রায় অভিভূত হলেন দুজন। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

নানা রস বিথারয়ে বিনোদ-নাগর।
আছুক আনের কাজ কাম-অগোচর ॥ ৫৮৭ ॥
... ...
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়।
রস অবসাদে দোঁহে সুখে নিদ্রা যায় ॥ ৫৮৮ ॥

কিছু পরেই ঘুম ভেঙে যায় গৌরাঙ্গদেবের। সেদিনকার রাতের ঘুমে ভেঙে যাবার সঙ্গে অন্য রাতের বিস্তর ফারাক। সে রাত ঐতিহাসিক রাত। এক অনন্য রাত। 'পরমা প্রকৃতি বিষ্ণুপ্রিয়ায়' দেখি তার আভাস: "আর গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন প্রভু। তাঁর মনের মাঝে বৃন্দাবনের প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠল। তাঁকে যে সেখানে যেতে হবে। তিনি যে সেই প্রাণমন আকুল করা বাঁশরীর করুণ সুর শুনতে পাচ্ছেন। তাঁকে যেন বৃন্দাবন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। চোখের পাতা দুটিকে এক করতে পারেন না প্রভু। বড় কষ্ট হচ্ছে তাঁর প্রিয়াকে ছেড়ে যেতে। কিন্তু যেতে যে তাকে হবেই।" আজ তিনি প্রাণপ্রিয়াকে চরমতম আঘাত দিয়ে যেতে না পারলে নবদ্বীপ যে 'গুপ্ত বৃন্দাবন' এ মাহাত্ম্য প্রকাশিত হবে না কোনদিন। লুপ্ততীর্থ'ই থেকে যাবে চিরদিন। কিন্তু ইতিহাস তা হতে দেবে না। তাই চৈতন্যমঙ্গলে:

রজনীর শেষে প্রভু উঠিলা সত্বর।
বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রা যায় অতি ঘোরতর॥
বৈরাগ্য-সময়ে প্রেমা উভারে অধিক।
সন্ন্যাস করিব বলি উনমত-চিত॥

গৌরাঙ্গদেবের এ সময়কার যন্ত্রণা দ্বিমুখী। একদিকে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে ত্যাগ করা অন্যদিকে সন্ন্যাস গ্রহণের আকুলতা। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে তিনি শুধু প্রিয়াকেই কাঁদাবেন কিন্তু তা নয়। তাঁর মত সর্বভারতীয় পরিচিতি পাওয়া মানব কাঁদাবেন অনেককেই। এবারও একটু মায়ার আশ্রয় নিতে হল তাঁকে। "শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কালনিদ্রা আসিল। স্বামী সোহাগিনী সরলা অবলা স্বামীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতেছেন। তিনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা। কালরাত্রির শেষে শ্রীগৌরাঙ্গ ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিলেন। নিদ্রিতা প্রিয়ার ঘুমন্ত ছবিখানি প্রাণ ভরিয়া দেখিলেন। প্রিয়ার ঘুমন্ত ছবিখানি বড় সৌন্দর্যময়, বড় মধুময়, শ্রীগৌরাঙ্গ অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রিয়ার ঘুমন্ত ছবিখানি অনিমেষ নয়নে দেখিলেন।"

[বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত]।

এ দেখার বুঝি শেষ নেই। এ দেখা শাশ্বত দেখা। আর বসে থাকলে চলবে না। বিছানা ছেড়ে উঠতে হবে। কিন্তু প্রিয়ার 'বাম চরণ'? যেটি তাঁরই অঙ্গের উপরে। আস্তে আস্তে নিজের অঙ্গ থেকে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বাম চরণটি সন্তর্পণে তিনি একটি বালিশের ওপর রাখলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী প্রভুর বুকে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিলেন। যাতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ঘুম কিছুতেই ভেঙে

না যায়, এমন আল্‌তো ছোঁয়ায় প্রিয়ার মস্তকটি একটি বালিশের ওপর রাখলেন। 'বংশীশিক্ষা'য় দেখি—

নিদ্রিতা বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীরামচরণ।
পার্শ্বে উপাধানোপরি করিয়া রক্ষণ॥
বক্ষস্থলে নিজগঞ্জ উপাধান দিয়া।
বাহির হইলা গোরা দ্বার উদ্ঘাটিয়া॥

রাতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্বামীকে নিজের হাতে সাজিয়েছিলেন। সে সমস্ত আভরণ একে একে ত্যাগ করলেন চৈতন্যদেব। চৈতন্যোদয় হয়েছে তাঁর। আর এক মুহূর্তও নয়। হলেন অনাবৃত দেহ। শীতের রাত। খালি পা। পরিধানে কেবল একটুকরো বসন। বিষয় বৈরাগীর রূপ ধরলেন এবার তিনি। সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত হতে তাঁকে এবার যেতে হবে কাঞ্চন নগরে। কেশব ভারতীর কাছে। তাঁর যাত্রার শুভ উদ্দেশ্য যাতে সফলতা প্রাপ্ত হয় তার জন্য তিনি দক্ষিণ নাসা দিয়ে শ্বাসগ্রহণ করলেন। চৈতন্যমঙ্গলে—

প্রাতঃকালে উঠি প্রভু প্রাতঃ ক্রিয়া করি।
সন্ন্যাস করিব—দঢ়াইলা গৌরহরি॥
কাঞ্চন-নগরে আছে ভারতী-গোসাঁই।
সন্ন্যাস করিব তথা পণ্ডিত নিমাই॥
একান্ত করিয়া মনে কৈল বিশ্বম্ভর।
যাত্রাকালে লৈল দক্ষিণ নাসার স্বর॥ ৫৯৪

লঘুভাবে বলা যায়, ঠিক এই সময়েই এখানেই গৌরাঙ্গদেব এক নিশ্বাসেই তাঁর নবদ্বীপ লীলা তথা সংসারলীলায় সমাপ্তি রেখা টেনে দিলেন। যেন নবজন্ম হল তাঁর তথা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর। দু'জনারই আলাদা ভাবে,এককভাবে, স্ববুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে, একলা চলার পথের শুরু হল বলা যেতে পারে। সন্ন্যাসে চিরতরে যাবার বেলায় তিনি "মনে মনে স্বর্গত পিতাকে স্মরণ করলেন। প্রণাম জানালেন তাঁর উদ্দেশে। জননীর দ্বারপ্রান্তে মাথা নত করে দু ফোঁটা চোখের জল ফেললেন। দাদা বিশ্বরূপের উদ্দেশ্যে শির আনত হল। নবদ্বীপের স্মৃতি ছায়ার মত তাঁর মনের নেপথ্যে এসে উদয় হ'লো। তাকেও তিনি শেষ সম্ভাষণ জানালেন। মনে মনে বললেন—হে আমার বাল্যের লীলাপাঠ নবদ্বীপ, কৈশোরের কুঞ্জবন, যৌবনের বন্ধু, সংকীর্তনের তীর্থক্ষেত্র, হে আমার জননী জন্মভূমি, বিদায়! বিদায়!

[পরমা প্রকৃতি বিষ্ণুপ্রিয়া]

৯১৬ বঙ্গাব্দের ২৭শে মাঘ শেষ রাত্রি, ইংরাজি মতে ২৫ জানুয়ারি ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ স্বামী পরিত্যক্তা হলেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী।

কাল রাত্রির দুই দণ্ড থাকতেই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বংশীশিক্ষায়—

ক্রমে সেই কালরাত্রি লয়োন্মুখ হইলা।
চমকিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া অমনি জাগিলা॥

জেগেই লক্ষ্য করলেন বিছানায় প্রাণনাথ নেই। কখন তিনি নিঃশব্দে উঠে গেছেন। সযত্নে প্রিয়াকে এমনই কায়দায় শুইয়ে রেখে গেছেন যেন স্বামী অঙ্গে একাঙ্গী হয়ে আছেন তিনি এমনই অবস্থা। পরিস্থিতি ভেবে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন তিনি। দেখেন দরজা হাট করে খোলা। বংশীশিক্ষায়—

জাগিয়া দেখেন সতী নাহি প্রাণনাথ।
দ্বার উদ্ঘাটন দেখি শিরে হানে হাত॥

মনকে পরক্ষণেই বোঝান স্বামী তাঁকে ছেড়ে অন্যত্র যেতে পারেন না। ভাবেন হয়ত রঙ্গ করে কোথাও লুকিয়ে আছেন। তাই তিনি ঘরের চারিদিক আঁতি পাঁতি করে খুঁজতে থাকেন। কিন্তু একি? চমকে ওঠার মত বিষয় বটে! প্রভুর পরিধানের বিভিন্ন ভূষণ, আভরণ তিনি ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় কুড়িয়ে পেতে থাকেন। এখন আর অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখতে পান না তিনি। এই পরিস্থিতির বর্ণনাও দিয়েছেন লোচন দাস খুব বাস্তব-সম্মত ও মর্মস্পর্শী ভাষায়—

"এথা বিষ্ণুপ্রিয়া, চমকি উঠিয়া, পালঙ্কে বসিয়া বুলায় হাত।
প্রভু না দেখিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া, শিরে মারে করাঘাত॥
এ মোর প্রভুর, সোনার নূপুর, গলার সোনার হার।
এ সব দেখিয়া, মরিব ঝুরিয়া, জিতে না পারিব আর।
মুঞি অভাগিনী, সকল রজনী, জাগিল প্রভুরে লৈয়া।
প্রেমেতে বান্ধিয়া, মোরে নিদ্রা দিয়া, প্রভু গেল পলাইয়া॥

এতক্ষণে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যেন বুঝতে পারলেন কেন তিনি গতদিবসে সারা-ক্ষণই প্রায় অমঙ্গল দর্শন করেছেন। অনুধাবন করলেন তাঁর শুভবিবাহের সময় বাসরঘরে স্বামীর সঙ্গে ঢুকতে গিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলে উছট্ খাওয়ার কথা। এসবই কি এই ভবিতব্যের ইঙ্গিত? নিজের দুই বছরের বিবাহিত জীবনের চিত্রপট উল্টে গেলেন এক ঝলকে। 'ভারতের সাধিকা'য় বলা হচ্ছে—

"মুহূর্তে নিজের এই চরম দুর্দৈবকে উপলব্ধি করলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। বুঝলেন, স্বামী চিরতরে ত্যাগ করেছেন তাঁকে, ছুটে বেরিয়েছেন সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য। কদিন ধরে এই দুর্দৈবের ছায়াপাতই তো বারবার হচ্ছিল বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর্লোকে, আজ তা সংঘটিত হয়ে গেল। দৈবের বিধান নির্মম করে মুছে দিয়ে গেল তাঁর দাম্পত্য জীবনের সকল কিছু আশা আকাঙ্খা।"

নিজেকে আর সামলাতে না পেরে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এবার শাশুড়ীর ঘরের দরজার কাছে গিয়ে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বাসুদেব ঘোষ এই দুঃসহ চিত্র পদে এঁকে রেখেছেন ঃ

শচীর মন্দিরে আসি দুয়ারের কাছে বসি
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন মন্দিরে ছিল নিশা অন্তে কোথা গেল
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া॥

শচীদেবী ঘুমের ঘোরেই শুনতে পেলেন বধূর এ কান্নার আওয়াজ। অমঙ্গল আশঙ্কায় ধরফড় করে উঠে বসলেন বিছানায়।

রোদনের সহ শুনি স্ববধূর ভাষ।
জাগিয়া উঠিলা মাতা হইয়া হতাশ॥
দ্বার উদ্ঘাটিয়া মাতা বাহিরে আসিলা।
কি হলো কি হলো বলে বধূরে ধরিলা॥

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শাশুড়ির মনে আশঙ্কার ছায়াপাত দেখে তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তাকে চেপে রাখতে পারলেন না। তাঁর মনের বদ্ধমূল ধারণাকে প্রকাশ করেই ফেললেন শাশুড়ীর কাছে। বংশীশিক্ষায়—

শচীর বচন শুনি কন বিষ্ণুপ্রিয়া।
পলায়েছে তব পুত্র মোদের ছাড়িয়া॥

এতক্ষণে মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল শচীদেবীরও। তিনি ছুটে গেলেন পুত্রের ঘরের ভেতর। সব শূন্য দেখে উঠোনে আছাড় খেয়ে পড়ে তিনি হাহাকার করতে থাকলেন। আবার মনে ক্ষণিক আশা দেখা দেওয়ায় দৌড়ে নিজেই বাতি জেলে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে সাথে নিয়ে পুত্রকে খুঁজতে বেরোলেন। বাসুদেব ঘোষ বলেছেন—

তুরিতে জ্বালিয়া বাতি দেখিলেন ইতি উতি
কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে কান্দিয়া কান্দিয়া পথে
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া॥

রাত্রির অবসানে শাশুড়ী-বধূ যখন স্থির বুঝতে পারলেন নিমাই চির-কালের জন্য তাঁদের বিদায় দিয়ে চলে গেছেন তখন উভয়েরই শোকাকুল অবস্থা। এরই মধ্যে চরমভাবে ভেঙে পড়েছেন তাঁরা। তাঁদের হৃদয় বিদারক ও মর্মভেদী আর্তনাদে নদীয়ার সকলে জেনে গেলেন এ দুঃসংবাদ। বংশী-শিক্ষায়—

দুয়ের রোদনধ্বনি শুনিয়া সকলে।
ব্যস্ত হয়ে শচীগৃহে দৌড়াদৌড়ি চলে ॥
শচীগৃহে যাঞা সবে করেন শ্রবণ।
অলক্ষিতে পলায়েছে শচীর নন্দন ॥

এই ভয়ঙ্কর বুকফাটা কাহিনী শুনে চতুর্দিক থেকে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ও নবদ্বীপবাসীরা ছুটে এলেন গৌরাঙ্গদেব পরিত্যক্ত বাড়িতে। শচীদেবীকে ঘিরে একে একে জড়ো হলেন শ্রীবাস, নিত্যানন্দ, বাসুঘোষ, চন্দ্রশেখর, মালিনীদেবী প্রমুখ। কাঁদছেন সকলেই। সখী কাঞ্চনাও ছুটে এসেছে প্রিয় সখীর কাছে। সেও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে ধরে অঝোরে কাঁদছে। বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী পড়ে আছেন মৃতবৎ। চারিদিক শোকাকুল। ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাচ্ছেন ভক্তবৃন্দও। চৈতন্যমঙ্গলে—

বিচ্ছেদে বিয়োগময় হৈল নবদ্বীপে।
শোকের পর্ব্বত যেন সবাকারে চাপে ॥
পরিজন পুরজন শচী বিষ্ণুপ্রিয়া।
মূর্চ্ছিত হইয়া কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥ ৫৯৬ ॥
শচীদেবী কান্দে কোলে করি বিষ্ণুপ্রিয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া মরা যেন রহিল পড়িয়া ॥

সবাই চেষ্টা করে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে চেতনে আনলেন। নিদারুণ দুঃখ-জনক অবস্থা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর। তিনি কিছুতেই মনে রাখতে পারছেন না যে, এক বিশেষ ব্যক্তির অর্ধাঙ্গিনী তিনি। একজন সাধারণ গৃহবধূর মতই আচরণ করছেন। অবশ্য সবাই বেশ অনুধাবন করতে পারছেন বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর মর্মান্তিক অবস্থার। এই কিছুক্ষণ আগেও তিনি চরম সুখী ছিলেন। সেই সুখের সংসার মুহূর্তে ভেঙে তছনচ। স্বামী-সঙ্গ সুখ বঞ্চিত রমনীর দুঃখের শেষ নেই। একথা কেই বা না বোঝে। নিজের মনেই আত্মবিশ্লেষণ করছেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। বাসুদেব ঘোষ তাঁর পদাবলীতে চিত্রায়ণ করেছেন সে অনুভূতি।

গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেছে মোর।
আর কি গৌরব আছে তোর ॥
আর কি গৌরাঙ্গ চাঁদে পাবে।
মিছা প্রেমআশ আশে রবে ॥
সন্ন্যাসী হইয়া পঁহু গেল।
এ জনমের সুখ ফুরাইল ॥
কাঁদি বিষ্ণুপ্রিয়া কহে বাণী।
বাসু কহে না রহে পরাণি ॥

নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিত ছিলেন বৈষ্ণব ভক্ত ও পণ্ডিত সমাজের প্রাণ বিশেষ। সেই প্রাণ রূপ নিমাই চলে যাওয়াতে দেহরূপী সবার হৃদয় ধক্ ধক্ করে জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। চৈতন্যমঙ্গলে ঃ

দেহমাত্র আছে—প্রাণ গেল ত ছাড়িয়া।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে ভূমি লোটাইয়া ॥
শচীদেবী কান্দে—ডাকে 'নিমাই' বলিয়া।
আগুনি পোড়য়ে যেন ধকধক হিয়া ॥

শাশুড়ি বধূকে সুস্থ করার বৃথা চেষ্টা করেন কেউ কেউ। কিন্তু সবারই ভাঙা মন। শচীদেবী যাকেই কাছে পান, আঁকড়ে ধরছেন নিমাইকে খুঁজে ধরে আনার জন্য। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এসব শুনে ও লক্ষ্য করে স্বাভাবিক হবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন কিন্তু যখনই স্বামীর ফেলে যাওয়া আভরণগুলি দেখছেন তখনই সাধারণ মানবীর মত বুকফাটা কান্নায় আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন। এই তো মাত্র একটা বেলাতেই তাঁর অবস্থা হয়েছে উন্মত্ত পাগলিনীর মত। অথচ সামনে পড়ে আছে সমুদ্রের মত বিশাল জীবন। তাঁর স্বামীর স্বহস্তে বেঁধে দেওয়া সুন্দর চুল এলোমেলো হয়ে ধুলায় লোটাচ্ছে। গায়ের বসন কখন খুলে গিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে হিয়া নাহিক সম্বিত।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে—উনমত-চিত ॥ ৬০১ ॥
বসন না দেয় গায়ে—না বান্ধয়ে চুলি।
হাকান্দ-কান্দনা কান্দে উন্মত্ত-পাগলী ॥
[চৈতন্যমঙ্গল—লোচন দাস]

পুত্রবধূ এবং শাশুড়ীর এই মর্মান্তিক অবস্থা দেখে গৌরাঙ্গদেবের ভক্ত ও অনুরাগীজন প্রভুর সন্ধানে বেরোবারই সিদ্ধান্ত নিলেন। একথা তাঁরা দেবীদের জানালেনও। কিছুটা আশ্বস্ত হলেন শচীমাতা। সমবেত ভক্তবৃন্দ পরামর্শ করে নিত্যানন্দ ও চন্দ্রশেখর আচার্যকে কাটোয়া অভিমুখে পাঠালেন, গৌরাঙ্গদেবকে পেলে বুঝিয়ে গৃহে ফিরিয়ে আনতে। দামোদর পণ্ডিত, বক্রেশ্বর ও অন্যান্যরা বেরোলেন আরকদিকে—আরেকদিকে।

এই সবা লৈয়া নিত্যানন্দ চলি যায়।
প্রবোধিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়॥ [ঐ]

গৌরাঙ্গদেবের খোঁজে যাবার সময় নিত্যানন্দ শচীমাকে আলাদাভাবে কাছে ডাকলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কানে না যায় এভাবে তিনি শচীমাকে প্রবোধ দিলেন। 'ভারতের সাধিকায়' নিত্যানন্দর মুখে বলা হয়েছে—'মা তোমার নিমাই কাটোয়ায় গিয়েছে, আচার্য কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নেবার জন্য। একথা কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্তকে তিনি জানিয়েছিলেন আগে থেকে। আমরা এক্ষুণি কাটোয়ায় ছুটে যাচ্ছি। প্রভুকে সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে হয়তো পারব না কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি, তোমার নিমাইকে নিয়ে আমি ফিরে আসবো, তোমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটাবো।'

যথাসময়েই গৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা হয়ে যায়। সেদিন ২৯শে মাঘ। চন্দ্রশেখর এবং নিত্যানন্দ সে সময় সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। দীক্ষান্তর নাম হল তাঁর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। কৃষ্ণ প্রেমাবেশে এ সময় তিনি নানা লীলা প্রদর্শন করতে থাকেন কাটোয়ার সমবেত নারী-পুরুষদের সামনে। অন্ন-গ্রহণ করতেও ভুলে গেছেন তিনি। তবুও কিন্তু ভোলেননি নবদ্বীপবাসীর কথা। তিনদিন পর সামান্য অন্নজল মুখে দিয়েই মেসো চন্দ্রশেখর আচার্যকে নিজে থেকে নবদ্বীপে পাঠালেন সন্ন্যাসের খবর পৌঁছে দিতে।

হেনমতে দিবানিশি নাহি জানে সুখে।
তিনদিন বহি অন্ন-জল দিলা মুখে॥
হেনমনে প্রেমানন্দে দিন রাতি যায়।
শ্রীচন্দ্র শেখরাচার্যে দিলেন বিদায়॥ ৬৭৪॥
নবদ্বীপ-বাসী যত আমার লাগিয়া।
কান্দয়ে ব্যাকুল হৈয়া ডাকিয়া ডাকিয়া॥
নিশ্চয় না জানে মোর সন্ন্যাস-করণ।
সবারে জানাহ মোর এই বিবরণ॥

কহিল ঠাকুর—পুন হৈব দরশন।
অচিরে হইবে দেখা—না হও বিমন ॥ ৬৭৫ ॥ [ঐ]

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদ চন্দ্রশেখর আচার্য মারফত নবদ্বীপে এসে ঠিক পৌঁছুল। এ খবর কানে গেল শচীমাতা-বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীরও। সবার মনের সামান্য আশা-প্রদীপের সল্‌তেটুকুও এবার নির্বাপিত হল। স্বাভাবিক কারণ বশতঃই শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিরহযন্ত্রণা সহস্রগুণ বৃদ্ধি গেল। সখী কাঞ্চনা এক মুহূর্তও এ কদিন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে ছেড়ে নড়ে নি। প্রভুর সেবক ঈশাণ সমস্ত সংসারের ভালমন্দ দেখাশুনা করছেন। কিন্তু জননী ও ঘরণী এই দুই নারীকে আজ ক'দিন হল এক মুষ্টি অন্নও কেউ খাওয়াতে পারেনি। পুরনরনারীরা দিবারাত্রি পালা করে শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে সান্ত্বনার বারিতে সিঞ্চিত করে যান। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কান্নায় এ সময় মানুষ তো স্বাভাবিক পশু-পক্ষীর, গাছ-পালারও হৃদয় থেকে যেন অশ্রু গলে ঝরে পড়ছে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে।
পশু-পক্ষী তরু-লতা এ পাষাণ ঝুরে ॥
হাহা প্রাণনাথ! ছাড়ি গেলে হে নদীয়া।
অনাথিনী বিষ্ণুপ্রিয়ায় নিঠুর হইয়া ॥ ৬৮১ ॥ [ঐ]

স্বামীর সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদ যখন একবার কানে এসেই গেছে তখন নিষ্ফল এ কান্নার অশ্রু। মনকে ভক্তির বাঁধনে বাঁধার চেষ্টা করেন বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী। তাঁর চলার পথ আর এখন আগের মত সোজা নেই। এ পথ নদীর বাঁক নেবার মত বেঁকে গেছে। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর স্বামী যে এখন একজন পরম প্রেমময় পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন এ কথা তিনি মনে মনে উপলব্ধি করছেন আর নিজের ভক্তিশূন্য জীবনকে ধিক্কার দিচ্ছেন। মনে ভক্তি সঞ্চয় করতে পারলে হয়ত এ অসময়ে এই কঠিন শাস্তি পেতে হত না।

মুই অভাগিনী তোমার ভকতি না জানি।
সেই অপরাধে বুঝি হৈলুঁ অনাথিনী ॥ ৩৮৪ ॥ [ঐ]

অনুশোচনা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মনে, যে মূল্যবান স্বামী রতনটিকে তিনি নিজ ভুলে হারিয়েছেন তা যে এখন তাঁর ধরা ছোঁয়া নাগালের বাইরে। তিনি যে এখন জগতময় নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন ধূপের ধোঁয়ার মত। এই ব্যাপ্তি ও নিজের ক্ষুদ্রতার কথা ভেবে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী মরতেই চান।

হায় হায় কিবা দৈব হইল আমারে।
গৌর বিনু আমার সকল আন্ধিয়ারে ॥
... ...
কোন্ দেশে যাব—লাগি পাব কোন্ ঠাঁই।
যাইতে না দিব কেহো—মরিব এথাই ॥ [ঐ]

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী মরতে চাইলেই তাঁকে আর মরতে দেবে কে? তিনি যে স্বামীর দৌলতে এখন বহু-বহু-বহু চোখের পাহারায়। ভক্তবৃন্দের মনও বাঁক নিচ্ছে তাঁর দিকেই। আত্মোপলব্ধিতে দুঃখের দহন ও অনুতাপে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী নিজেকে 'পাপীষ্ঠা' বলে মনে করছেন। তিনিও যদি পুণ্যাত্মা হতেন তাহলে এত দুঃখ বুঝি তাঁর হত না, এই-ই ভাবছেন তিনি। আর অহরহ 'প্রভু প্রভু' বলে তাঁর প্রাণপতি রূপে বিশ্বপতিকে ডাকছেন। তাঁর কাতর ডাক যার কানে যাচ্ছে, সেই কাঁদছে। লোচন দাস যেন শুনেছেন সে কান্না—

পাপিষ্ঠ শরীর মোর—প্রাণ নাহি যায়।
ভূমিতে লোটাইয়া দেবী করে হায় হায় ॥ ৬৯০ ॥
... ...
প্রভু প্রভু বলি ডাকে ক্ষণে আর্তনাদে।
বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে সর্ব্বজন কাঁদে ॥ [ঐ]

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আত্মদহনে উপস্থিত ভক্তজনেদের মলিনতা ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাচ্ছেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। প্রতিবেশীনীরা ও সখীরা তাঁর জ্ঞান ফেরাবার জন্য কানের কাছে মুখ নিয়ে 'গৌরনাম' করলেই তাঁর মূর্চ্ছা ভাঙছে। ওদিকে রাধাআবেশে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা চৈতন্যদেব। কৃষ্ণের জন্য তিনি চেতন হারাচ্ছেন। আবার কৃষ্ণ-নাম করলেই চেতন ফিরছে তাঁর। এদিকে গৌরের জন্য চেতন হারাচ্ছেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। গৌরনাম করলেই চেতনে আসছেন তিনি। আলাদা আলাদা জায়গায় অবস্থান করলেও একই সঙ্গে তাঁরা নাম প্রচারের সহায় হচ্ছেন উভয়ে। একজনের 'কৃষ্ণনাম' অপরের 'গৌরনাম'। একজনকে শোনাতে হচ্ছে 'কৃষ্ণকথা'। অন্যকে 'গৌরকথা।' এবার বয়জ্যেষ্ঠারা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে কোলে তুলে নিয়ে বোঝাতে লাগলেন। রাঙিয়ে দিতে লাগলেন তাঁর মন গৈরিক রঙে। বললেন, মা বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি বুদ্ধিমতী। 'আমাদের মত সাধারণ জনের সাধ্য নেই তোমাকে সান্ত্বনা দেবার। নিজের

থেকেই তোমাকে শান্ত হতে হবে। তোমার স্বামী যে ইচ্ছাময়। তিনি যে স্বতন্ত্র প্রভু। তাতো তুমি জানো। তিনিই তো তোমাকে বলেছেন, যখনই তাঁকে ডাকবে তিনি তোমার কাছে আসবেন। দেখা দেবেন। তুমি তো সেই শক্তিমানেরই শক্তি। তাঁর অংশভাগিনী, নারায়ণী, ইচ্ছাময়ী, ভগবতী। উভয়ে উভয়কে তোমরা ইচ্ছা করলে ভালোরূপেই জানতে পারো। লোচন দাস যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন সেকথা—

তোর প্রভু তোর আগে কহিয়াছে কথা।
যথা তথা যাই তোর নিকটে সর্ব্বদা ॥
তোর অগোচর নহে তোর প্রভুর কাজ।
বুঝিয়া প্রবোধ দেহ নিজ-হিয়া-মাঝ ॥ ৬৯৩ ॥ [ঐ]

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবৃত জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল যেন। যে আগুন অন্তরে ছাইচাপা অবস্থায় ছিল তা যেন সবাই উসকে দিলেন। তিনিও ভাবলেন, তাঁর নাম তো 'বিষ্ণুপ্রিয়া।' স্বামীও তাঁকে বলেছেন 'বিষ্ণুর' 'প্রিয়া' হতে। গৌর যদি সত্যিই নারায়ণ তথা বিষ্ণু হন তাহলে তাঁর প্রিয়া হিসেবে তাঁর নাম তো সার্থক। কিন্তু ওই ছলনায় ভুলবেন না তিনি। তাঁর স্বামীকে তিনি মানব গৌর হিসেবেই পেতে চান, নারায়ণ গৌর হিসেবে নয়, তাই তাঁর ইচ্ছা তিনি পরিচিত হবেন 'গৌরপ্রিয়া' হিসেবে। এবার মনে এল স্বামী তাঁকে 'নাম' করতে বলেছেন। সেতো কৃষ্ণনাম। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তো কৃষ্ণনাম করবেন না। তিনি স্বামীর নাম গানই করবেন। গৌরনাম, গৌরধাম, গৌরকাম, গৌর স্মরণ, গৌরমনন, গৌরচিন্তন—এই-ই তো প্রসার করা এখন তাঁর একমাত্র কাজ। স্থির করলেন এবার থেকে তিনি 'তাঁর' নাম গানই করবেন। উপস্থিত নারীপুরুষ-ভক্ত সবাইকে নিয়ে তিনি গৌরনাম আরাধনা করতে লাগলেন। স্বামী করেছেন 'নগর কীর্তনের' প্রচলন। তিনি করলেন 'পারিবারিক কীর্তনের' প্রচলন। এই-ই বুঝি শুরু হল বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর স্বামী আরাধনা তথা সাধনা। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও দেখিয়ে দিতে চান চৈতন্যজীবন ও চৈতন্যলীলায় এবং নবদ্বীপ বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে তিনি শুধুমাত্র স্বামী পরিত্যক্তা স্ত্রী নন, মূর্তিমতী সাধনারই প্রতীক। সাধনার সূচনায় দেখি—

এত চিন্তি নাম লৈতে বসিলা সবাই।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া আর যত যত যেই ॥
কি বালক বৃদ্ধ কিবা যুবক যুবতী।

নাম লৈতে বসিলা গৌরাঙ্গ করি গতি ॥
নাম পাশে বান্ধিল গৌরাঙ্গ মত্ত সিংহ।
দাণ্ডাইলা মহাপ্রভু—গতি হৈল ভঙ্গ। ৬৯৬ ॥ [ঐ]

চৈতন্যদেব কাটোয়াতে কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নেবার পর বৃন্দাবন যাবার উদ্দেশে ১লা, ২রা ও ৩রা ফাল্গুনে রাঢ় প্রদেশেই দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে বেরিয়েছেন। নিত্যানন্দ তাঁকে পথ ভুলিয়ে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য, শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে নিয়ে তোলা এবং শচীমাতা বধূমাতার সঙ্গে তাঁকে সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দেওয়া। কিন্তু নিত্যানন্দ একা যেন পারছিলেন না। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁর শক্তি দিয়ে, সাধনা দিয়ে নবদ্বীপে বসে সে অসাধ্য কাণ্ডটি ঘটিয়ে দিলেন। তপস্বিনী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সাধিকা জীবনে প্রবেশের সূচনায়ই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের গতি ভঙ্গ হল। 'বিষ্ণুপ্রিয়া চরিতে'—"ভক্তের ক্রন্দন শ্রীভগবানের কর্নে প্রবেশ করিল। শচীদেবীর গৃহে যে শ্রীগৌরাঙ্গ নামের মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই নামসংকীর্ত্তন যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের কর্ণে ভক্তের আকুল ক্রন্দনের রোল পৌঁছিল।" নাম পাশে বেঁধে ফেলা হল গৌরাঙ্গসুন্দরকে। হু হু করে কেঁদে উঠল নবীন সন্ন্যাসীর অন্তরাত্মা। শুরুতেই হেরে গেলেন তিনি নবীনা সাধিকার কাছে।

নাম পাশে বান্ধিল গৌরাঙ্গ মত্তসিংহ।
দাণ্ডাইলা মহাপ্রভু—গতি হৈল ভঙ্গ ॥ ৬৯৬ ॥
নিত্যানন্দ-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া রহিলা।
অঝোর-নয়নে প্রভু কান্দিতে লাগিলা ॥
যাহ নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আজ তুমি।
শান্তিপুরে সবারে দেখিয়ে যেন আমি ॥ [ঐ]

শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে চৈতন্যদেবকে রেখেই নিত্যানন্দ নবদ্বীপে রওনা হতে দেরি করলেন না। নবদ্বীপ পৌঁছেই তিনি লক্ষ্য করলেন গৌর অদর্শনে এখানে সকলের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ভগ্নপ্রায়, এখানকার মানুষজনের সঙ্গে প্রকৃতিও যেন কাঁদছে। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও শচীদেবীর অবস্থা আরও শোচনীয়। সেই সঙ্গে গৃহে গৃহে চলছে অরন্ধন। এ অবস্থার নিপুণ চিত্রকর লোচন দাস। তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে—

নদীয়া-নগরের লোক জীয়ন্তেতে মরা।
কাটিলে কুটিলে রক্ত মাংস নাহি তারা ॥

উদরে নাহিক অন্ন—টলমল তনু।
সর্ব্ব অন্ধকার তারা গোরাচাঁদ বিনু॥

শচীদেবীর বাড়িতে এসে আঙিনায় দাঁড়িয়ে নিত্যানন্দ বললেন, মা আমি কথা রেখেছি। আমি তোমাদের শান্তিপুরে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি। সেখানে উনি তোমাদের দর্শন দেবেন। নিত্যানন্দর মুখের কথা শেষ না হতেই নবদ্বীপবাসীদের মধ্যে 'সাজ সাজ' পড়ে গেল। সবাই তৈরী হতে উঠে পড়ে লাগল। এদিকে চতুর নিত্যানন্দ একটি সময়োপযোগী ছলনা করলেন। তিনি জানেন, এ বাড়ির দুই অনাথিনী, হতভাগিনী নারী নিরন্ন উপবাসে দিন কাটাচ্ছেন। তাই বললেন, কিছু রান্না কর তাড়াতাড়ি, আমি আজ কদিন উপবাসে। তোমরাও কিছু খেয়ে নাও। নাহলে অতপথ যাবে কি করে? কথামত শচী-বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী রন্ধনে বসলেন। নিত্যানন্দকে ভোজন করিয়ে শচী-বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যৎ সামান্য অন্নগ্রহণ করলেন। দুয়ারে শিবিকা প্রস্তুত। বাড়ির বাইরের রাস্তায় অগুনতি লোকের জমায়েত। সবাই শান্তিপুর যাবে। শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তৈরি হয়ে শিবিকার কাছে এলেন। এমন সময় নিত্যানন্দ সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিষ্ঠুরভাবে চৈতন্যদেবের একমাত্র গোপন শর্তটি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে বাধ্য হলেন। তাহল, সবাই আসতে পারবে শুধুমাত্র বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী পারবেন না। এই এই গোপন শর্তটি শুনে সমবেত ভক্তবৃন্দ 'হা কৃষ্ণ' বলে রোদন করে উঠল। শচীমাতা 'হা নিমাই' বলে আর্তনাদ করে মাটিতে আশ্রয় নিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে শান্ত অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লেন। যেন তিনি ভেঙে পড়েননি মোটেই। আসলে সন্ন্যাসী ব্যক্তির পত্নীর মুখ দর্শন নিষিদ্ধ। একথা কিন্তু শচীমাতা মানতে রাজি নন। পতি মুখ দর্শনের জন্য অধীরা বৌমাকে ফেলে শান্তিপুরে তিনি পুত্র সন্দর্শনে স্বার্থপরের মত যেতে পারবেন না, তা নিত্যানন্দকে জানিয়ে দিলেন। তিনি চেয়েছিলেন স্বামীর মুখ দেখে তাঁর আদরের বধূটির মনে শান্তি ফিরে আসুক। সাময়িকভাবে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ভেঙে পড়লেও এবার তাঁর কর্তব্যে কঠোর হলেন। নিজের মনকে তিনি সচেতন করে তুললেন, বর্তমানে তাঁর পরিচয় তিনি সন্ন্যাসী স্বামীর পরিত্যক্ত বধূ। আজ থেকে আজীবন পর্দার অন্তরালেই পর্দানসীন, অসূর্যম্পশ্যা হয়ে তাঁকে কাটিয়ে দিতে হবে। কঠিন থেকে কঠিনতম হলেন তিনি। বিরহকে চিরতরে বরণ করে নিলেন। তিনি মনকে জানালেন ও বোঝালেন বিরহই ঈশ্বর আরাধনার

প্রধান সোপান। ঘর থেকে বাইরে মাথায় বড় ঘোমটা দিয়ে বেরিয়ে আসেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। তাঁর শেষ সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে সবাই অপেক্ষা করে আছেন। ঘোমটার আড়ালে ঢাকা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মুখ কেউ দেখতে পান না। দেখা যায় না তাঁর মাটিতে শক্ত করে চেপে ধরা পায়ের পাতাও। শাড়ি লুটিয়ে পড়ে চরণকেও আবৃত করে রেখেছে। সবাই অপেক্ষা করছেন। শান্তিপুরে নির্বিঘ্নে এঁদের রওনা করিয়ে দেওয়া যে তাঁরই কর্তব্য। এঁদের জন্যই তো স্বামীদেবতা শান্তিপুরে উন্মুখ অপেক্ষায় রয়েছেন। 'ভারতের সাধিকায়'—'এবার এগিয়ে আসেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। শান্ত ধীর স্বরে বলেন, "মা আমি তাঁর কাছে গেলে তাঁর সন্ন্যাসব্রত ভঙ্গ হবে, হয়তো এ জন্যই আমায় যেতে বারণ করেছেন। আমি সহধর্মিণী। তাঁর আচরিত ধর্ম রক্ষা করা আমারই কর্তব্য। কিন্তু আপনি কেন যাবেন না? তিনি যে আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছেন।'

এরপর আর রওনা না দিয়ে পারা যায় না। বরফের মত ঠাণ্ডা পাষাণ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এখন থেকে ভক্তবৃন্দের চোখ দিয়েই স্বামীকে দেখবেন। ষোল বছরের এক তরুণী কোথা থেকে এ ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন তার উত্তর সম্ভবতঃ ভারতের মাটিই দিতে পারবে। যে ধরণী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে সীতাকে বক্ষে স্থান দেয়, সেই ধরণীই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর হৃদয়কে পাষাণে পরিণতও করে। গোটা নবদ্বীপ শান্তিপুরে ছুটে গিয়েছিল চৈতন্যদেবের দরশনে। শচীদেবীর শিবিকার পেছন পেছন সে যেন এক অনন্তযাত্রার মিছিল। পদ রচয়িতা মুরারি গুপ্ত সে চিত্র এঁকেছেন—

"চলিল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আগে শচী আর সবে চলিলা পশ্চাতে ॥
হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ সবাকার মুখে।
নয়নে গলয়ে ধারা হিয়া ফাটে দুখে ॥
গৌরাঙ্গ বিহনে ছিল জীয়ন্তে মরিয়া।
নিতাই বচনে যেন উঠিল বাঁচিয়া ॥
হেরিতে গৌরাঙ্গ মুখ মনে অভিলাষ।
শান্তিপুর ধায় সবে হৈয়া উর্দ্ধশ্বাস ॥
হইল পুরুষশূন্য নদীয়ানগরী।
সবাকার পাছে পাছে চলিল মুরারি ॥

সবাইকে শান্তিপুরে রওনা করিয়ে দিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী নিজেকে আর সামলিয়ে রাখতে পারলেন না। ভূমিতে শয্যা পেতে নিজের শরীরকে সঁপে দিয়ে অঙ্গ আছড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। আর সেদিন থেকে তিনি পালঙ্কে শোয়া ত্যাগ করলেন। তাঁর এ বিরহ কান্নার শ্রোতা সখি কাঞ্চনা। বিষ্ণু-প্রিয়াদেবীর চোখে ভেসে ওঠে রামের বনবাসের দৃশ্য। পত্নী সীতাকে নিয়ে রাম বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একই সঙ্গে দুজন কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন। তবে তাঁর বেলায় এ উলটো নিয়ম হল কেন? বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করে পদ কর্তা বাসু ঘোষ লিখেছেন—

কাঁদে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া
লোটাঞা লোটাঞা ক্ষিতিতলে।
ওহে নাথ কি করিলে পাথারে ভাসায়ে গেলে
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে॥
এ ঘর জননী ছাড়ি মোরে অনাথিনী করি
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস।
বেদে শুনি রঘুনাথ লইয়া জানকীসাথ
তবে সে করিলা বনবাস॥
পুরুবে নন্দের বালা যবে মধুপুরে গেলা
এড়িয়া সকল গোপীগণে।
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া নিজতত্ত্ব জানাইয়া
রাখিলেন তা সবার প্রাণে।
চাঁদ মুখ না দেখিব আর পদ না সেবিব
না করিব সে সুখ বিলাস।
এ দেহ গঙ্গায় দিব তোমার শরণ নিব
... ...

রামচন্দ্র ও গৌরচন্দ্র একই অবতারতত্ত্ব হলেও দুজনের আবির্ভাবের যুগ ছিল আলাদা। তাই তাঁদের লীলাও হয়েছে যুগোপযোগী রূপেই। কলি-যুগের ভক্তিশূণ্য কঠিন হৃদয় মানবের মনকে দ্রবীভূত করার জন্যই গৌরচন্দ্রকে করুণ রসের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। তাই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে ত্যাগ করা। এ সম্পর্কে 'বিষ্ণুপ্রিয়া চরিতে' বলা হয়েছে—

'শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে সঙ্গে লইয়া বনবাসী হইয়াছিলেন, শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে গৃহে রাখিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। লোক শিক্ষার নিমিত্ত বৈরাগ্যের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া জীবের অন্তর দ্রব করাইলেন।' এটুকু বললে খুবই কম বলা হবে। এখান থেকেই মূলতঃ আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব ত্যাগ ও নিষ্ঠায় এবং কৃচ্ছ্রসাধন ওভক্তিপ্রেমার্তিতে ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বিশিষ্ট স্থানের অধিকারিণী। সে সম্পর্কে সময়মত বিস্তৃত আলোচনায় আসা যাবে। আমরা ফিরে আসি মূল পর্বে।

বর্ষীয়সী রমণীগণ সকলেই শান্তিপুরে গেছেন শচীদেবীর সঙ্গে। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে দেখার জন্য রয়েছেন শুধু কাঞ্চনা, মনোহরা, সুকেশী, চন্দ্রকলা, অমিতা, সুরসুন্দরী, প্রেমলতিকা, সখি বিষ্ণুপ্রিয়া প্রমুখ তাঁর আটজন প্রধানা সখি। এখান থেকেও মহিলা মহলে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জনপ্রিয়তা বোধগম্য। তাঁর নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতাও এই দুঃসময়ে দীপ্যমান। এক মুহূর্তের জন্যও সখিবৃন্দ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে ফেলে কোথাও যাচ্ছে না। গৌরকথা, গৌরনাম করে তারা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মনকে সুস্থ করার চেষ্টা করছে। প্রধানা সখি কাঞ্চনার অবস্থা অনেকটা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মতই। অন্য সখিবৃন্দ তাঁকেও সুস্থ রাখার চেষ্টা করছে। বৃদ্ধ গৃহভৃত্য ঈশাণ একাই দেবীদের ও চৈতন্য-বিহনে সবদিকের অবস্থাই সামাল দিচ্ছে। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অন্তরের শূন্যতা এবং নবদ্বীপের শূন্যতা দেখে বাসুদেব ঘোষ লিখেছেন—

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে অরুণ বসন পরে
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।
কি লাগিয়া মুখ চাঁদে রাধা রাধা বলি কাঁদে
কি লাগি ছাড়িল নিজ দেশ ॥
... ...
জ্বলন্ত অনল হেন রমণী ছাড়িল কেন
কি লাগি ত্যজিল তার লেহ।
কি কব দুখের কথা কহিতে মরমে ব্যথা
না দেখি বিদরে মোর হিয়া ॥
দিবা নিশি নাহি জানি বিরহে আকুল প্রাণি
... ...

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী মন খুলে সখিদের কাছে নিজের সব চাপা দুঃখের কথা স্রোতের মত গলগল করে বলে যচ্ছেন। তাঁর একটাই অনুশোচনা, তিনি

যদি প্রভুর রমণী না হতেন তাহলে নদীয়াবাসীর মত তিনিও শান্তিপুরে যাবার জন্য অনুমতি পেতেন। তিনি আক্ষেপে বলছেন, বিধি কেন তাঁকে প্রভুর ঘরণীরূপে গড়লেন? সে জন্যই তো জগতের সবার যা অধিকার আছে তা তাঁর নেই। এমন হবে আগে জানলে তিনি কুমারী বয়সেই তাঁর প্রেমে পড়তেন না। মুরারি গুপ্ত সান্ত্বনার ছলে একটি পদে লিখেছেন—

সখি হে গোরা কেন নিঠুরাই মোহে।
জগতে করিল দয়া দিয়া সেই পদছায়া
বঞ্চল এ অভাগীরে কাহে॥
গোরপ্রেমে সঁপি প্রাণ জিউ করে আনচান
স্থির হৈয়া রইতে নারি ঘরে
আগে যদি জানিতাম পিরীতি না করিতাম
যাচিঞা না দিতু প্রাণ পরে॥
আমি ঝুরি যার তরে সে যদি না চায় ফিরে
এমন পিরীতে কিবা সুখ।
চাতক সলিল চাহে বজর ক্ষেপিলে তাহে
যায় ফাটি যায় কিনা বুক॥

হিসেব ঠিক রাখছেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। তিনদিন হয়ে গেল শচীদেবী শান্তিপুরে গেছেন। এখনও ফিরছেন না। মুখ ফুটে আর যেন সখিদের কাছে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কিছু বলতে চান না। নিজের হতভাগ্য কপালের কথা ভেবে, নিজেকে গৌরবহীনা নারী ভেবে নিজের মনে নিজেই এবার স্বগতোক্তি করছেন। বাসু ঘোষের পদাবলীতে—

গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেছে মোর।
আর কি গৌরব আছে তোর॥
আর কি গৌরাঙ্গ চাঁদে পাবে।
মিছা প্রেম আশ আশে রবে॥
সন্ন্যাসী হইয়া পহুঁ গেল।
এ জনমের সুখ ফুরাইল॥
কাঁদি বিষ্ণুপ্রিয়া কহে বানী।
... ...

শান্তিপুরে পৌঁছেই শচীদেবী কাঁদতে কাঁদতে পুত্রের কাছে অনুযোগ করেন, এত লেখাপড়া শেখালাম তোমায়, তার বিনিময়ে তুমি নিলে সন্ন্যাস।

সুখের সংসার, যুবতী ভার্যা, অনাথিনী মা ও অন্যদের ত্যাগ করলে। উচ্চ শিক্ষার ফল কি এই? আমার দিন না হয় ফুরিয়েই এসেছে কিন্তু বধূমাতার কি হবে?

নদীয়ার ভোগ ছাড়ি মায়েরে অনাথা করি
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস॥
কর জোড়ি অনুরাগে দাঁড়াল মায়ের আগে
পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়া।
দুই হাতে তুলি বুকে চুম্ব দিলা চাঁদ মুখে
কাঁদে শচী গলাটি ধরিয়া॥
ইহার লাগিয়া যত পড়াইলাম ভাগবত
এ দুখ কহিব আমি কায়।
অনাথিনী করি মোরে যাবে বাছা দেশান্তরে
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হইবে উপায়॥

মায়ের কান্না দেখে চৈতন্যদেব মাটিতে দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে বললেন, তুমি এভাবে কাঁদলে আমি দুঃখ পাই। কান্না সংবরণ কর। লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলে:

মায়েরে কহিল—আর না কান্দহ তুমি।
তোমার কান্দনায় চিত্তে দুঃখ পাই আমি॥

পুত্রকে অনুশোচনা করতে দেখে, দুঃখিত হতে দেখে শচীদেবী এই সুযোগে বলেন, তাহলে তুমি এসব পোশাক ছেড়ে গৃহে ফিরে চল। আমাদের সঙ্গে আবার সুখে সংসার করবে। তোমাকে ব্রাহ্মণ ডেকে নতুন করে গলায় যজ্ঞসূত্র পরিয়ে দেব। তাহলে আমার, বধূমাতার, নদীয়াবাসীর দুঃখ দূর হবে।

মুই বৃন্ধা মাতা তোর মোরে ফেলাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ দিলি গলায় গাঁথিয়া॥
তোর লাগি কাঁদে সব নদীয়ার লোক।
ঘরেরে চলরে বাছা দূরে যাক শোক॥
শ্রীবাসাদি নিত্যানন্দ যত ভক্তগণ।
তা সবারে লৈয়া বাছা করহ কীর্ত্তন॥
মুরারি মুকুন্দ বাসু আর হরিদাস।
এ সবে ছাড়িয়া কেন করিলা সন্ন্যাস॥

যে করিলা সে করিলা চলরে ফিরিয়া।
পুন যজ্ঞসূত্র দিব ব্রাহ্মণে ডাকিয়া॥ [বাসু ঘোষ]

ভক্তবৃন্দ ভাবলেন প্রভু এবার বুঝিবা জননীর কাছে হেরে গেলেন। খুশি হলেন তারা। এমন সময় চৈতন্যদেব সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ঠিক আছে জননী যা চান আমি তাই করব। এইবার কিন্তু 'শচীদেবী পুত্রের ধর্মনাশ হইবে, এই ভয়ে এ কথার উত্তর দিতে পারেন নাই। মৌনী থাকিয়া সম্মতি লক্ষণ দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী জগন্নাথ মিশ্রও বিশ্বরূপকে সন্ন্যাসাশ্রম হইতে ফিরাইয়া আনিবার কথা হইলে সকলকে এই কথাই বলিতেন। শচীদেবীর মনে সেই সাধু পুরুষের বাক্য জাগরিত ছিল। তাই তিনি তাঁহার নিমাইচাঁদকে গৃহে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়া পুত্রের ধর্মনাশের পাপের ভাগী হইলেন না।' [বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত]

শচীদেবীর এ হেন আচরণ উপস্থিত ভক্তবৃন্দের বুকে শেলসম আঘাত হেনেছিল। সকলেরই যে একমাত্র ভরসা ছিলেন তিনি। ভক্তরা ভেবেছিলেন শচীদেবী যদি পুত্রকে সংসারে ফিরিয়ে নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকেন তাহলে প্রভুর মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। অতি দুঃখে তাই তারা বললেন—

হেন বাক্য কেন মাতা কহিলে আপনে।
শ্রুতিবাক্য সম ইহা খণ্ডে কোন জনে॥
নীলাচলে যাইতে আপনে আজ্ঞা দিলে।
দুর্লঙ্ঘ্য তোমার বাক্য কেন বা কহিলে॥ [চন্দ্রোদয় নাটক]

শচীদেবীর পুত্রকে এই অনুমতি দেবার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে 'বিষ্ণুপ্রিয়া চরিতে' বলা হয়েছে—

'এই যে জননীর সম্মতি লইয়া প্রভু নীলাচলে চলিলেন, সকলের সমক্ষে জননীর সম্মান রাখিয়া বলিলেন, তুমি যদি পুনরায় গৃহে ফিরিতে বল, তাহাই করিব, এটি প্রভুর বিচিত্র লীলা। লোক শিক্ষার জন্য জননীর কর্ত্তব্য কি তাহা দেখাইলেন।'

আবার চৈতন্যদেব শচীমাতাকে রন্ধনের জন্য আবদারও করলেন। তিনি যে কৃষ্ণকে আগে ভোগ নিবেদন করবেন। তারপর নিজে ভোজন করবেন। পুত্রের কথামত রন্ধনশালায় গেলেন শচীদেবী। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে—

পাক কৈল শচীমাতা জগত-জননী।
আনন্দে ভাসিলা সীতাদেবী নারায়ণী॥

ভোজন করায় অদ্বৈত বড় পরিপাটি।
সকল ব্যঞ্জন পুত্রে দিল মিঠিমিঠি ॥
ভোজন করয়ে প্রভু ত্রিদশের রায়।
দেখিয়া সকল ভক্ত আনন্দ হিয়ায় ॥

চৈতন্যদেদের ভোজনের শেষে ভক্তগণ তাঁর প্রসাদ পেলেন। শুরু হল দিন রাত ধরে নর্তন কীর্তন। শান্তিপুর যেন নবদ্বীপপুরী হয়ে উঠল।

সন্ন্যাস করিলা প্রভু কারো নাহি মনে।
আনন্দে গোঙায় দিনরাত্রি সংকীর্তনে ॥ [ঐ]

এরপর চরম সময় এসে উপস্থিত। চৈতন্যদেব প্রকাশ করলেন তাঁর নীলাচল যাত্রার সময়ের কথা। আর ভক্তদের আদেশ করে গেলেন দিনরাত্রি কীর্তন করে যেতে। একথা তখন থেকে আমৃত্যু অক্ষরে অক্ষর 'পারিবারিক কীর্তনের' মধ্যে দিয়ে পালন-প্রচার-প্রসার করে গেছেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী।

নীলাচল যাব জগন্নাথ-দরশনে।
দয়া করে যদি প্রভু প্রসন্ন বদনে ॥
তোমরা থাকিবে—আজ্ঞা করিবে পালন।
নিরন্তর দিবানিশি করিবে কীর্তন ॥ ৭২৪ ॥ [ঐ]

ভক্তবৃন্দ ভাবলেন শচীমাতা তো পুত্রকে নীলাচলে থাকার অনুমতি দিয়েছেন তাই তাঁর প্রতি আর কোন আস্থা রাখা অর্থহীন। প্রভুকে আটকাতে হলে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকেই স্মরণ করতে হয়। এছাড়া অন্য কোন গতি নেই। কারণ দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াতো শচীমায়ের মত স্বমুখে স্বামীকে অনুমতি দেননি। তাঁর অনুমতির ও তো প্রয়োজন আছে। অতএব তাঁর কথা বলে যদি প্রভুকে শেষবারের জন্য আটকানো যায়। ভক্তবৃন্দ প্রভুকে বললে—

বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে।
শূন্য হৈল নবদ্বীপ নগরে বাজারে ॥
... ...
বিষ্ণুপ্রিয়া মরিব শব্দমাত্র শুনি।
এ কথার সম্বিধান করহ আপনি ॥ [ঐ]

এ কথায় টললেন না চৈতন্যদেব। কারণ তিনি ভক্তের ভগবান হয়ে জানেন ভক্তগণ সব মায়ার অধীন। তাঁকেও মায়ায় বাঁধতে চাইছেন তারা। কিন্তু যে নিজেই মায়াময় তাঁকে মায়া দিয়ে কি শুধু আটকানো যায়? সঙ্গে সঙ্গেই প্রার্থিত উত্তর পেল ভক্তবৃন্দ—

কিবা ভক্ত বিষ্ণুপ্রিয়া কিবা মাতা শচী
যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি ॥ [ঐ]

মাতা হোক, বিষ্ণুপ্রিয়া হোক, কোনো সাধারণ ভক্ত হোক, যে কৃষ্ণভজনা করবে তিনি তারই কোলেতে অবস্থান করবেন। বিদায়ক্ষণ এগিয়ে আসছে। ভক্তদের অনুমতি ছাড়াও যেতে পারেন না তিনি। কারণ ঈশ্বর ভক্তেরও অধীন। বাসুদেব ঘোষের পদে—

শ্রীপ্রভু করুণ স্বরে ভকত প্রবোধ করে
কহে কথা কান্দিতে কান্দিতে।
দুটি হাত জোড় করি নিবেদনে গৌরহরি
সবে দয়া না ছাড়িহ চিতে ॥
ছাড়ি নবদ্বীপবাস পরিলু অরুণ বাস
শচী বিষ্ণুপ্রিয়ারে ছাড়িয়া।
মনে মোর এই আশ করি নীলাচলে বাস
তোমা সবার অনুমতি লৈয়া ॥
নীলাচল নদীয়াতে লোক করে যাতায়াতে
তাহাতে পাইবা তত্ত্ব মোর।
এত বলি গৌর হরি নমো নারায়ণ স্মরি
অদ্বৈতে ধরিয়া দিল কোর ॥

চৈতন্যদেব ভক্তবৃন্দকেও একইভাবে জননীর মতই শিক্ষা দিলেন। এবার আর কেউ তাঁকে বাধা দিতে সাহস পেল না। তাঁর বিদায়ক্ষণটি সকলেরই চোখের জলে ভেসে গেল। সে দৃশ্যের ছবি এঁকেছেন পদকর্তা নয়নানন্দ—

সকল ভকত ঠাঞি হইয়া বিদায়।
নীলাচল দেখিতে চলিল গৌর রায় ॥
মায়ের চরণ বন্দি অনুমতি লৈয়া।
অদ্বৈত আচার্য্য ঠাঞি বিদায় হইয়া ॥
চলিলা গৌরাঙ্গ পঁহু বলি হরিবোল।
আচার্য্য মন্দিরে উঠে ক্রন্দনের রোল ॥

গৌরশূন্য নবদ্বীপে ফিরে যেতে হবে ভেবে এবার ভক্তবৃন্দের যত ক্ষোভ গিয়ে পড়ল পাষণ্ডী ও নিন্দুকদের ওপর। এদের উদ্ধারের জন্যই প্রভুকে জননীও যুবতী ভার্যা ছাড়তে হল। বৃন্দাবন দাস তাঁর পদাবলীতে এই দুঃখের কথা বলেছেন ঃ

নিন্দুক পাষণ্ডগণ প্রেমে না মজিল।
অযাচিত হরিনাম গ্রহণ না কৈল॥
না ডুবিল শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমের বাদলে।
তাদের জীবন যায় দেখিয়া বিফলে॥
তাদের উদ্ধারহেতু প্রভুর সন্ন্যাস।
ছাড়িলা যুবতী ভার্য্যা সুখের গৃহবাস॥
বৃদ্ধা জননীর বুকে শোকশেল দিয়া।
পরিলা কোপীন ডোর শিখা মুড়াইয়া॥

ক্রমে শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপে ফিরে এল সকল ভক্তবৃন্দ। সঙ্গে পুত্রশোকে কাতরা শচীমাতা। তারা শচীমাতাকে গৃহে পৌঁছে দিয়ে গৌর পরিবারের নামে জয়ধ্বনি দিল। দুঃখী দীন কৃষ্ণদাসের পদে :

জয় জয় মহাপ্রভু জয় গৌরচন্দ্র।
জয় বিশ্বম্ভর জয় করুণার সিন্ধু॥
জয় শচীসুত জয় পণ্ডিত নিমাঞি।
জয় মিশ্র পুরন্দর জয় শচী আই॥
জয় জয় নবদ্বীপ জয় সুরধুনী।
জয় লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর গৃহিনী॥

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এই ঘটনায় পুরোপুরি বুঝে গেলেন যে, এই জন্মের মত স্বামী দর্শন তাঁর ভাগ্য থেকে মুছে গেছে। ষোড়শী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পক্ষে স্বামী বিচ্ছেদ ভয়ঙ্কর হলেও বাস্তব সত্য ছিল। তবুও স্বামীকে দেখার জন্য তাঁর মন একান্তে আকুলি বিকুলি করত। তাঁর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে কেশব ভারতীর ওপর। বাসুদেব ঘোষ সে হৃদয়যন্ত্রণা তুলে ধরেছেন :

সন্ন্যাসী হইয়া গেলা পুন যদি বাহুরিলা
আইল নাথ নদীয়া নগরে
আমারে না দিল দেখা কি মোর করমের লেখা
প্রাণ কাঁদে দেখিবার তরে॥
হরি হরি গৌরাঙ্গ এমন কেনে হৈলা

সবারে সদয় হৈয়া মুই নারীরে বঞ্চিয়া
এ শোক সাগরে ভাসাইলা ॥
এ নবযৌবন কালে মুড়াইলা চাঁচর চুলে
কি জানি সাধিলা কোন সিধি।
কি জানি ভারতী কে পশুবৎ পণ্ডিত সে
গৌরাঙ্গে সন্ন্যাসে দিলা বিধি ॥
অক্রুর আছিল ভাল রাজ বোলে লৈয়া গেল
থুইল লৈয়া মথুরা নগরী।
নিতি লোক আইসে যায় তাহাতে সংবাদ পায়
ভারতী করিল দেশান্তরী ॥

ভারতের সাধিকায় দেখি—'বিরহের দুঃসহ আগুন ধিকি ধিকি ক'রে জ্বলছে বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ে। এবার এ হৃদয় বুঝি পুড়ে খাক্ হয়ে যাবে। কিন্তু এই দুঃসহ আগুনের তাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তাঁকে।

পুত্র শোকে বিহ্বল শাশুড়ীকে যে তাঁকেই সর্তকভাবে আগলে রাখতে হবে, নিরন্তর সেবা-পরিচর্যা দিয়ে সুস্থ ক'রে তুলতে হবে। চির-আরাধ্য স্বামীর, পরম প্রিয় প্রাণ প্রভুর জননী মৃতকল্প হয়ে রয়েছেন, আর রয়েছেন বিষ্ণুপ্রিয়ারই উপর একান্তভাবে নির্ভর ক'রে। তাই শাশুড়ীর সেবাও হয়ে ওঠে বিষ্ণুপ্রিয়ার আচরণীয় ধর্মকর্মের এক বৃহৎ অংশ।'

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কর্তব্য পরায়ণতার দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হয়ে যায় নবদ্বীপ বাসী। তারা অবাক বিস্ময়ে ভাবেন কোন সামান্যা নারীর পক্ষে বুকে শোকের পাথর চাপা রেখে কর্তব্য নিষ্ঠা দেখানো সম্ভব নয় কখনই। মহৎ প্রাণ ভক্তরা তখন শ্রীচৈতন্যর আবির্ভাবের আধ্যাত্মিক কারণ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন পঞ্চমুখে। পদকার অনন্ত আচার্য সেরকম একটি পদ রচনা করেছেন—

আসিয়া গোলোকনাথ পারিষদগণ সাথ
নবদ্বীপে অবতীর্ণ হৈয়া।
স্থাপিয়া যুগের কর্ম্ম নিজ সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম
বুঝাইলা নাচিয়া গাইয়া ॥
ধরি রূপ হেম গৌর পরিলা কৌপীন ডোর
অরুণ কিরণ বহির্ব্বাস।
করে কমণ্ডলু দণ্ড ধরিলা গৌরাঙ্গচন্দ্র
ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া অভিলাষ ॥

'বিষ্ণুপ্রিয়া চরিতে' বলা হয়েছে—'শচীদেবী এক্ষণে কথঞ্চিৎ সুস্থিরা হইয়াছেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে সঙ্গে করিয়া বৃদ্ধ সেবক ঈশানের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যান। গৃহদেবতার পূজার জন্য পুষ্প চয়ন করেন। ঠাকুরের ভোগের জন্য পূর্ব্বের মত নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন পাক করেন। নিমাইচাঁদের মঙ্গলের জন্য নিত্য ঠাকুরের স্থানে করযোড়ে প্রার্থনা করেন। পুত্র যে যে দ্রব্য আহার করিতে ভালোবাসিতেন, সেই সেই দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া ঠাকুরের ভোগ দেন। প্রভুর ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করেন। এই রূপে শচীদেবীর দিন যাইতেছে।'

প্রসাদ বিতরণের পর শচীদেবী নিজে প্রসাদ গ্রহণ করেন। কিছুতেই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে তাঁর সাথে আহারে বসাতে পারেন না। তাঁর পাতের এঁটো কিছুটা প্রসাদ গ্রহণ করেই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দিন চলে যায়। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আহার সম্পর্কে প্রেমদাস রচিত পদটিতে সেই রকম সমর্থনই পাওয়া যায়—

যে দিন হইতে ছাড়িল নদীয়া।
তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া॥
দিবা নিশি পিয়ে গোরানাম সুধাখানি।
কভু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরানি॥
বদন তুলিয়া কার মুখ নাহি দেখে।
দুই এক সহচরী কভু কাছে থাকে॥
হেন মতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী।
গৌরাঙ্গ বিরহে কান্দে দিবস রজনী॥

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আহারের পরিমাণ ও ধরণ দেখে অন্তরে দুঃখ পান শচীদেবী। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মনঃ কষ্ট তাঁরও মনকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার এত দুঃখের মাঝেও তাঁর সেবার কোন ত্রুটি হতে দেন না বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। এতেও তিনি একটা সুখ মিশ্রিত অন্তর্দাহ অনুভব করেন। শচীদেবীর অস্বস্তি ও আন্তরিকতা হরিদাস গোস্বামীর পদে—

চির-অনাথিনী সোনার পুতলী
বিষ্ণুপ্রিয়া এবে বালিকা।
কিছু নাহি জানে বাছারে আমার
নবীন—কুসুম—কলিকা॥
পারিনা দেখিতে মুখখানি তার

হুতাশের ছায়া বিষাদ-আগার,
পাগলিনী প্রায় থাকে নিরন্তর,
(তার) আহার মাত্র কণিকা ॥
মুখে নাই বাক্ ঝরে দুটি আঁখি।
(আহা !) কি জ্বালা সহিছে বালিকা ॥

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে ঘিরেই শচীদেবীর অপত্য স্নেহ গড়ে উঠেছে। বধূ-মাতা একা হলে কি হবে যেন দুজনের ভূমিকা পালন করছে সে। বিজনে তাঁর যে বিরহ কান্না তা প্রশ্নাতীত। এই কান্নাকে মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত তার 'গৌরপ্রিয়া'-তে বলেছেন "গৌরবিরহে গৌরময়ীর ক্রন্দন, কৃষ্ণ-বিরহে রাধিকার কান্না একই। ব্যাপক অর্থে এ হলো প্রেমময় রসময় সর্বকান্তি, ভগবানরূপ কান্তর জন্য ভক্তরূপ —কান্তার অনন্ত বিরহ ক্রন্দন।'

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর এ কান্নাকে আমরা ঈশ্বরকে পাবার আর্তি হিসেবেই বিচার করতে পারি। তবে শাশুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি উচ্চস্বরে আর কাঁদেন না বটে তবে এ সময় মাঝে মাঝেই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী মর্ম্মী সখীদের কাছে নিরিবিলিতে গৌর-বিরহ জ্বালার কথা অকপটে স্বীকার করতেন। যদিও তিনি জানেন চৈতন্যদেব এখন আর তাঁর একার নয়। তাঁকে ব্যক্তিগত স্বার্থে আটকে রাখা যায় না। তিনি শুধু তাঁরই মন চুরি করে ক্ষান্ত হননি, জগৎবাসীর মনই চুরি করে নিয়েছেন। তবুও তাঁকেই একান্তভাবে কাছে পেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁর সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে ইচ্ছা করেন। সে ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে বাসু ঘোষের পদে।

সে বহুবল্লভ গোরা জগতের মনচোরা
আমার করিতে চাই একা।
হেন ধন অন্যে দিতে পারে বল কার চিতে
ভাগাভাগি নাহি যায় দেখা ॥
সজনি লো মনের মরম কই তোরে।
না হেরি গৌরাঙ্গ মুখ বিদরিয়া যায় বুক
কে চুরি করিল মন চোরে ॥
লও কুল লও মান লও শীল লও প্রাণ
লও মোর জীবন যৌবন।
দেও মোরে গোরানিধি যাহে চাহি নিরবধি
সেই মোর সরবস ধন।

সেজন্যই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী মনে মনে ঠিক করে নিলেন যে, তাঁর প্রাণবল্লভ যেখানে গৃহত্যাগী হয়েছেন, সেখানে তাঁর কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রতই পালনীয়। একে একে খুলে ফেললেন সমস্ত অলংকার। পরিধানের প্যাটের শাড়ি খুলে পরলেন গেরুয়া পোশাক। ছেড়ে দিলেন চুল বাঁধা। 'বিষ্ণুপ্রিয়া চরিতে' দেখি—'দেবী মনে মনে স্থির করিলেন, তিনি আয়তির লক্ষণ সকল কিছুই আর রাখিবেন না। কারণ তিনি এক্ষণে চিরজীবনের মত স্বামী-সঙ্গ-সুখে বঞ্চিতা এবং কাজে কাজেই সধবা হইয়াও বিধবা। তাঁহার আর বস্ত্রালঙ্কারের প্রয়োজন কি?'

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর এই সময়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করেছেন বলরাম দাস—

তোমার অঙ্গে শাটী পরা তার কৌপীন পরিধান
তুমি থাকো গৃহ মাঝে,
শীত গ্রীষ্ম রৌদ্রে সে যে,
নিশিদিন প্রভুর আমার বৃক্ষতলে অবস্থান।

'ভারতের সাধিকা'-তে আছে এর সমর্থন—'এই নূতন পরিস্থিতিতে নিজের জন্য নূতন দিনচর্যার ব্যবস্থা করলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। ভোগের পথ চিরতরে ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসের কৃচ্ছ্রময় পথটি বেছে নিয়েছেন তাঁর স্বামী। তাই সেই ভোগের পথ থেকে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও সরে এলেন, গ্রহণ করলেন কঠোর বৈরাগ্য আর তপস্যাময় জীবন।'

সন্ন্যাসী স্বামীর স্ত্রী হিসেবে নিজেকেও সন্ন্যাসিনী সাজাতে হলে কি নিয়ম কানুন পালন করতে হবে তা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সঠিক জানেন না। সেজন্যই জনশ্রুতি আছে, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁর এই মনের ভাবটি স্বামীকে চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছিলেন। যদিও কোনও চৈতন্যচরিতকারের রচনায় এ সম্পর্কে সঠিক উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য প্রাচীন পদকর্তা বলরাম দাস এই জনশ্রুতিকে অবলম্বন করে অসাধারণ একটি পত্র রচনা করেছেন—

যে অবধি গেছ তুমি এ ঘর ছাড়িয়া।
সে হতে আছেন মাতা উপোস করিয়া॥
সদা তাঁর সঙ্গেতে মালিনী ঠাকুরাণী।
নৈলে প্রাণে এতদিন মরিতেন তিনি॥
খাওয়াইতে করি যত সাধ্য সাধন।
মোরে কোলে করি করেন দ্বিগুণ রোদন॥

মোর হাতে মা রাখিয়া চলে গেলে তুমি ।
অকুল পাথারে দেখ পরিলাম আমি ।।
পিতা চেয়েছিলেন মোরে বাড়ি লইবারে ।
তা কি আমি যেতে পারি মাকে একা ছেড়ে ।।
সন্ন্যাসী ঘরণীর নিয়ম কিছুই না জানি ।
কি খাইব কি পরিব লিখিবে আপনি ।।
হাতের কঙ্কণ ফেলিবারে হলো ভয় ।
পাছে বা তোমার কিছু অমঙ্গল হয় ।।
তোমার পাটের জোড় গলার চাদর ।
তোমার গলার হার চরণ নূপুর ।।
কি করিব এসকল সামগ্রী লইয়া ।
রাখিব কি, গঙ্গা মাঝে দিব ভাসাইয়া ।।
এ সব বারতা আমি কাহারে সুধাই ।
মাকে সুধাইলে মরি যাবেন নিশ্চয় ।।
মার কাছে থাক যদি বড় ভাল হয় ।
আমি কাছে না যাইব না করিহ ভয় ।।
তা হ'লে সে শান্ত হবে দুঃখিনী জননী ।
তাঁরে বলে দিও নিয়ম কি পালিব আমি ।।
আপনি যে সব তুমি নিয়ম পালিবে ।
তা' হতে কঠোর নিয়ম এ দাসীরে দিবে ।।
বাঁচিব ত্যজিয়া আমি ভূষণ ভোজন ।
সুখেতে করিব আমি মাটিতে শয়ন ।।
লোকে বলে তুমি নাকি আমার লাগিয়া ।
গার্হস্থ্য ছাড়িয়া গেলে সন্ন্যাসী হইয়া ।।
কেন আমি তোমার কি করিলাম ক্ষতি ।
কোন দিন সংকীর্ত্তনে করেছি আপত্তি ।।
আছাড়ে তোমার সর্ব্ব অঙ্গে লাগে ব্যথা ।
বল দেখি কোন দিন কহিয়াছি কথা ।।
খাট হ'তে ভূমে গড়াগড়ি দিতে তুমি ।
বল কোন দিন রাগ করিয়াছি আমি ।।
পাষাণ গলিত তোমার করুণ রোদনে ।

মোর দুঃখ রাখিতাম আপনার মনে ।।
আমারে দেখিলে যদি ধর্ম্ম নষ্ট হয় ।
আমি নয় রহিতাম বাপের আলয় ।।
বিষ্ণুপ্রিয়া পত্র লেখে কান্দিয়া কান্দিয়া ।
বলরাম দেখে পাছে থাকি দাঁড়াইয়া ।।

বাংলা পত্র সাহিত্যের স্রষ্টা বলে আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্তকেই জানি। কিন্তু প্রাচীন পদকর্তা বলরাম দাসই যে আদি পত্র সাহিত্যের মূল স্রষ্টা তার প্রামাণ্য উদাহরণ নিশ্চয়ই এই পত্রটি।

সন্ন্যাসিনীর সাজে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে দেখে শচীমাতা মনে খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। সন্ন্যাসী পুত্রের গর্ভধারিনী মা হয়ে তিনি স্বাভাবিক জীবন যাপন করেছেন আর কচি মেয়ে, বধূ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর একি সাজ? বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে তিনি বোঝাতে চান যোগিনীর বেশ তাঁর পক্ষে ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। বৈষ্ণব কবি সত্য কিংকর কুণ্ডু লিখেছেন—

বউমা! বউ মা! হয়ে পাগলিনী,
কি বেশ ধ'রেছ জননী!
(আহা) সোনার কমল বল মা আমার
কেন গো সেজেছ যোগিনী!
খুলিয়া ফেলেছ কনক-ভূষণ,
পরনে কেন মা গৈরিক বসন,
ননীর শরীরে বিভূতি মেখেচ,
হেরিয়া ফাটে গো পরাণি।
(আহা) হিয়ার মাণিক বল মা' আমার
কেন সেজেছ যোগিনী ।।

[বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত থেকে সংগৃহীত]

শচীমাতার শেষ কটা দিনের বাঁচার একমাত্র অবলম্বন এখন পুত্রবধূ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। এহেন বধূমাতার যোগিনীর সাজ এবার তাঁর মনে পুর্বা-তঙ্ক জাগিয়ে তোলে। তিনি চোখ মেলে আর দেখতে পারেন না বধূর এই সাজ। তিনি কাতর স্বরে অনুনয় করে বলেন—

সম্বর সম্বর ওরূপ জননী!
ওরূপে পরাণ চমকে।

(আহা) ঐ রূপে সাজি নিমাই আমার
ছাড়িয়া গিয়াছে পলকে।
তোমারে পাইয়া ভুলেছি তাহারে,
তুমিও কি যাবে ছাড়িয়া আমারে,
খোল মা! খোল মা! যোগিনীর সাজ
এস মা! হৃদয়-ফলকে।
(আহা) জ্বলে যায় বুক, বউ মা আমার
বিষাদ অনল ঝলকে। [ঐ]

শচীমাতা চান পুত্রবধূ যোগিনীর বেশ খুলে ফেলুন। তিনি চাইতেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সাধারণ বেশেই থাকুন। তাঁকে শুধুমাত্র কন্যারূপে দেখার আশায় শচীদেবী অপত্যস্নেহে আদর করে ডেকে ভোলান—

আয় মা! পরাই সুনীল বসন,
আয় মা! পরাই কনক-ভূষণ,
আয় ক'রে দিই কবরী বন্ধন
গৈরিক বসন খুলিয়া।
(আহা) জুড়া মা! আমার ব্যথিত জীবন
জননি! জননি! বলিয়া॥ [ঐ]

বৃদ্ধা শাশুড়ীর মনের এই ব্যথাকে লাঘব করতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে যোগিনীর বেশ পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। শাশুড়ী যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তাঁর মনোমত সাজসজ্জা তাঁকে করতে হয়েছিল। তাঁর দিক থেকে কোন আঘাত পান শাশুড়ি এটা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী চাননি বলেই শাশুড়ির মনোগত ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিতে শুরু করলেন। এভাবেই দৈনন্দিন সংসার যাত্রা নির্বাহ করতে গিয়ে মাতা শচীদেবীর মুখে তিনি শুনতেন পুত্রবিরহের বিলাপ। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মানসপটে স্পষ্ট প্রতীয়মান হত সন্ন্যাসীবেশী স্বামী চৈতন্য-দেবের কৃচ্ছ্রসাধনের ছবি। অর্থাৎ তিনি নিজেকে কখনই ভুলতে দিতেন না যে তিনি সন্ন্যাসী পরিত্যক্ত নারী। এছাড়াও সখী কাঞ্চনা, অমিতাদের অন্তরঙ্গ সাহচর্য, তাদের মুখে অহরহ গৌর গুণগাণ প্রতি মুহূর্তেই তাঁকে গৌর ধ্যানানুরাগিনী করে রেখেছিল। অতএব সাধনার উপযুক্ত এই রকম পরিবেশমণ্ডলে গৌরনামে নিজেকে সবসময় সমর্পিত করে রেখেছিলেন তিনি। স্বামী গৌরাঙ্গদেব বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে উপদেশ দিয়েছিলেন তাঁরই মত কৃষ্ণ-ভজনা করতে। এই কৃষ্ণভজনার মধ্যে দিয়েই হবে তাঁদের অন্তরের চির-

মিলন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কাছে কৃষ্ণভজনাই পরিণতি পেয়েছে গৌরভজনায়। চৈতন্যদেব যেমন কৃষ্ণবিরহে মাঝে মাঝেই মূর্চ্ছা যান, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও তেমনি মুহুর্মুহু গৌরীবিরহে মূর্চ্ছা যেতে থাকেন। চৈতন্যদেবের চৈতন্য ফেরাতে ভক্তমণ্ডলী জোরে জোরে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ ও কীর্তন করে। যে কৃষ্ণনাম তারা পেয়েছে চৈতন্যদেবের কাছেই—

"ভজ শ্রীকৃষ্ণ, কহ শ্রীকৃষ্ণ, লহ শ্রীকৃষ্ণের নাম রে।
যে জন, শ্রীকৃষ্ণ ভজে, সে হয়, আমার প্রাণ রে॥

তেমনই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীরও চৈতন্য ফেরাতে তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে অষ্টসখী উচ্চৈঃস্বরে করত গৌরকীর্তন। যে 'গৌরনাম' তারা পেয়েছে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কাছেই।

"ভজ শ্রীগৌরাঙ্গ, কহ শ্রীগৌরাঙ্গ, লহ শ্রীগৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন, শ্রীগৌরাঙ্গ ভজে, সে হয়, আমার প্রাণরে॥"

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর এই করুণ দশা দেখে অন্তরঙ্গ সখীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, আমরাই যদি গৌরবিরহ সহ্য করতে না পারি তাহলে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁর স্ত্রী হয়ে কেমন করে বাঁচবেন? তাদেরও সকলেরই রাগ এতদিনে গিয়ে পড়ে কেশব ভারতীর ওপর। পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ সখীদের এই মনের অবস্থা একটি পদে ঠিক তুলে ধরেছেন—

হরি হরি কি না হৈল নদীয়া নগরে।
কেশব ভারতী আসি কুলিশ পাড়িল গো
রসবতী পরাণের ঘরে॥
প্রিয় সহচরীগণে যে সাধ করিল মনে
সে সব স্বপন সম ভেল।
গিরি পুরী ভারতী আসিয়া করিল যতি
আঁচলের রতন কাড়ি নেল।
নবীন বয়স কি বা সে চাঁচর কেশ
মুখে হাসি আছয়ে মিশাঞা।
আমরা পরের নারী পরাণ ধরিতে নারি
কেমনে বাঁচবে বিষ্ণুপ্রিয়া॥

এভাবেই ক্রমে দিন যায়, বছরও যায়। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মুখ অনেকটা মলিন হয়েছে। বেশ বাস ততোধিক সাধারণ। তিনি নিজেই চৈতন্যদেবের একটি ছবি হাতে এঁকে সে ছবি বাঁধিয়ে তাতে স্বামী পূজা করেন। সকালে

শাশুড়ির সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাওয়া ছাড়া বাড়ির বাইরে আর একবারও পা রাখেন না। স্বামীর ছবিতে পুজো ছাড়া অন্যদিকে তিনি শাশুড়ির পরিচর্যায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। কাঞ্চনাও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পরিচর্যায় একইভাবে সমর্পিতা। পুরানো গৃহভৃত্য ঈশাণ শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর রক্ষণাবেক্ষণ করে। সেবক দামোদর পণ্ডিত চৈতন্যদেবের নির্দেশমত বছর ঘুরলেই নবদ্বীপে শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে দেখতে যান। শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর যাবতীয় খবর তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে নিবেদন করেন প্রভুর কাছে। 'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থে সে বিবরণ পাওয়া যায়—

তবে করজোড়েতে পণ্ডিত ক্রমে বোলে।
নদীয়ার ভক্তগণ আছয়ে কুশলে ॥
শচীমাতার বৎসলতা নিরুপম হয়।
তোমার মঙ্গল লাগি দেবে আরাধয় ॥
সাধুস্থানে আশীর্বাদ লহয়ে মাগিয়া।
আশীষ করয়ে নিজে ঊর্ধ্ববাহু হঞা ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার কথা কি কহিমু আর।
তান ভক্তি নিষ্ঠা দেখি হৈনু চমৎকার ॥
শচীমাতার সেবা করেন বিবিধ প্রকার।
সহস্রেক জনে নারে ঐছে করিবার ॥
প্রত্যহ প্রত্যূষে গিয়া শচীমাতাসহ।
গঙ্গাস্নান করি আইসেন নিজ গৃহ ॥
দিনান্তেহ আর কভু না যান বাহিরে।
চন্দ্র সূর্য্যে তান মুখ দেখিতে না পারে ॥
প্রসাদ লাগিয়া যত ভক্তবৃন্দ যায়।
শ্রীচরণ বিনা মুখ দেখিতে না পায় ॥
তান কণ্ঠধ্বনি কেহ শুনিতে না পারে।
মুখপদ্ম ম্লান সদা চক্ষে জল ঝরে ॥
শচীমাতার পাত্রশেষ মাত্র সে ভুঞ্জিয়া।
দেহরক্ষা করে ঐছে সেবার লাগিয়া ॥
শচী-সেবাকার্য্য সারি পাইলে অবসর।
বিরলে বসিয়া নাম করে নিরন্তর ॥

হরিনামামৃতে তান মহারুচি হয়।
সাধ্বী-শিখা-মণি শুদ্ধ প্রেম পূর্ণ কায় ॥
তব শ্রীচরণে তাঁর গাঢ় নিষ্ঠা হয়।
তাহান কৃপাতে পাইনু তাঁর পরিচয় ॥
তব রূপ-সাম্য চিত্রপট নিৰ্ম্মাইলা।
প্রেম ভক্তি মহামন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিলা ॥
সেই মূর্ত্তি নিভৃতে করেন সুসেবন।
তব পাদপদ্মে করি আত্ম সমর্পণ ॥
তান সদগুণ শ্রীঅনন্ত কহিতে না পারে ॥
এক মুখে মুঞি কত কহিমু তোমারে ॥

দামোদরের মুখে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দৈনন্দিন আচার আচরণ ও জীবন ধারার খবর পেয়ে চৈতন্যদেব একদিকে যেমন মনে মনে খুশি হন তেমনি অন্তরে গভীর কষ্টও অনুভব করেন। কিন্তু প্রকাশ করেন না কিছু। তাঁর এ আচরণটিও লোকশিক্ষারই জন্য। যদিও তিনি ভুলতে পারেন না দুঃখিনী মাতা ও হতভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কথা। সে জন্যই পণ্ডিত জগদানন্দকে হঠাৎ হঠাৎই নীলাচল থেকে নবদ্বীপে পাঠান সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য। কারণ তিনি তো মাতা, পত্নী ও নদীয়ার ভক্তদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন তাঁর বার্তা সময় মত তাঁরা পাবেন। প্রভুর নির্দেশ মতই নবদ্বীপে আসেন জগদানন্দ। পদকর্তা চন্দ্রশেখর আচার্যর বর্ণনায় জগদানন্দ হতভম্বের মত দেখেন নদীয়া নগরী যেন অচেতনপুরী।

ক্ষণেক রহিয়া চলিয়া উঠিয়া
পণ্ডিত জগদানন্দ।
প্রবেশি নগরে দেখে ঘরে ঘরে
লোক সব নিরানন্দ ॥
না মেলে পসার না করে আহার
কারো মুখে নাহি হাসি।
নগরে নাগরী কান্দয়ে গুমরি
থাকয়ে বিরলে বসি ॥
দেখিয়া নগর ঠাকুরের ঘর
প্রবেশ করিল যাই।
আধমরা হেন ভূমে অচেতন

পড়িয়া আছেন আই ৷৷

প্রভুর রমণী সেই অনাথিনী

প্রভুরে হইয়া হারা।

পড়িয়া আছেন মলিন বসনে

মুদল নয়ানে ধারা ৷৷

দাস দাসী সব আছয়ে নীরব

দেখিয়া পথিক জন।

শোধাইছে তারে কহ দেখি মোরে

কোথা হৈতে আগমন ৷৷

পণ্ডিত কহেন মোর আগমন

নীলাচল পুর হৈতে।

গৌরাঙ্গ সুন্দর পাঠাইল মোরে

তোমা সভারে দেখিতে ৷৷

শুনিয়া বচন সজল নয়ন

শচীরে কহল গিয়া।

আর এক জন চলিল তখন

শ্রীবাস মন্দিরে ধায়্যা ৷৷

শুনিয়া শ্রীবাস মালিনী উল্লাস

যত নবদ্বীপবাসী।

মরা হেন ছিল অমনি ধাইল

পরাণ পাইল আসি ৷৷

মালিনী আসিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়া

উঠাইল যতন করি।

তাহারে কহিল পণ্ডিত আইল

পাঠাইল গোরহরি ৷৷

শুনি শচী আই সচকিত চাই

দেখিলেন পণ্ডিতেরে।

কহে তার ঠাঁই আমার নিমাই

আসিয়াছে কত দূরে ৷৷

দেখি প্রেম সীমা স্নেহের মহিমা

পণ্ডিত কান্দিয়া কয়।

সেই গোরামণি যুগে যুগে জানি
তুয়া প্রেম বশ হয় ।।
হেন নীত রীত গৌরাঙ্গ চরিত
সভাকারে শুনাইয়া ।
পণ্ডিত রহিলা নদীয়া নগরে
সভাকারে সুখ দিয়া ।।

এইভাবে ভক্তদের যাতায়াত ও সংবাদ দেওয়া নেওয়ার মধ্যে দিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জীবনের কঠিন বছরগুলি কেটে যায়। একটি খবরের স্মৃতি তাঁকে ধৈর্য ধরতে শেখায় পরবর্তী সংবাদ আসার দিনটি পর্যন্ত। পরবর্তীকালে নবদ্বীপবাসী দামোদর পণ্ডিত প্রতি বছর ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলে গিয়ে যখন শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর খবরাখবর চৈতন্যদেবের সঙ্গে আদান প্রদান করতেন সে সময় শচীমাতা পুত্রের জন্য আদরের সঙ্গে বহু যত্নে নানা খাদ্যদ্রব্য, শুকনো মণ্ডা-মিঠাই, তৈরি করে প্যাটরা ভরে পাঠাতেন দামোদরের হাত দিয়ে। সেই তৈরি খাদ্যদ্রব্যে অবশ্যই থাকত বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীরও হাতের ছোঁয়া। দামোদরের হাত থেকে পরম মমতায় চৈতন্যদেব সেগুলি সানন্দে তুলে নিতেন। আবার দামোদরের যখন নবদ্বীপে ফিরে আসার সময় হত তখন চৈতন্যদেব পরম বিশ্বাসী ও নির্ভরযোগ্য দামোদরের হাত দিয়ে স্নেহময় জননীর জন্য পাঠাতেন জগন্নাথদেবের প্রসাদ ও অন্যান্য জিনিস এবং প্রেমময়ী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্য পাঠাতেন বহুমূল্য পাটের শাড়ি। এই পাটের শাড়ি চৈতন্যদেবের উপহার পাওয়া। উড়িষ্যারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র প্রতিবছর জগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিনে 'মহাপ্রভুকে' এই পট্টবস্ত্র দিতেন মাথায় পাগড়ি বেঁধে শোভাযাত্রায় বেরোবার জন্য। প্রতাপরুদ্রের মনোগত বাসনা ছিল তাঁর দেওয়া বস্ত্রখণ্ড প্রভু ও প্রভুপত্নীর অঙ্গস্পর্শ পেয়ে ধন্য হোক। প্রতাপরুদ্রের ইচ্ছা চৈতন্যদেব বুঝতেন বলেই রথের পরে ওই শাড়ি ঠিক বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কাছে পেঁছে দিতেন। চৈতন্যদেব প্রেরিত প্রসাদও শাড়ি নিয়ে পদকর্তা বলরাম দাস একটি পদে শচীমায়ের ভাবাবেগের বর্ণনা করেছেন—

কোথা গেলি বিষ্ণুপ্রিয়া শীঘ্র আয় মা চলিয়া
ক্ষেত্র হ'তে সমাচার এলো।

নিমাই মোর স্মরিয়াছে কত কিনা পাঠায়েছে
শচী পাছে বধূ দাঁড়াইল ॥
দামোদর শচী আগে শ্রীমহাপ্রসাদ রাখে
আর রাখে বহুমূল্য সাড়ী।
নন্দোৎসব দিনে রাজা বস্ত্র করে প্রভু-পূজা
প্রভু উহা পাঠায়েছেন বাড়ী ॥
শচী বলে বিষ্ণুপ্রিয়া ধর সাড়ী পর গিয়া
পাঠায়েছে নিমাই তোর লাগি।
বাড়িতে আসিতে নারে সদা তোমা মনে করে
সে তোমার সুখ-দুঃখ ভাগী ॥
দেবী সাড়ী করি বুকে বলিলেন জননীকে
সাড়ী তুমি বিলাইয়া দাও।

এই দেয়া নেওয়ার ঘটনা বুঝিয়ে দেয় চৈতন্যদেব মাতা-পত্নীকে কোনদিনই ভোলেননি। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রথমে শাড়ী বুকে নিয়ে তারপর তা বিলিয়ে দিতে বলার মধ্যে দিয়ে স্বামীর প্রতি তাঁর অভিমানকেই প্রকাশিত করে। স্বভাবতঃই এই শাড়িকে কেন্দ্র করে একটা মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক বিরাজমান থাকত শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সংসারে। যেহেতু বৎসরান্তে একবার মাত্র স্বামীর কাছ থেকে তত্ত্ব আসত বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কাছে সেহেতু স্বামীর মধুর স্পর্শসুখ অনুভব করার আশায় পেটিকা খুলে তাঁর পাঠানো উপহারের শাড়িতে হাত বোলান সময়ে অসময়ে। এই পেটিকাতেই যেন আছে তাঁর যাবতীয় সঞ্চিত সুখ-ঐশ্বর্য। বহুবল্লভ হয়েও শুধুমাত্র বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্য চৈতন্যদেব উপহার পাঠাচেছন বছরে বছরে এই দৃষ্টিভঙ্গীর সাবলীল ব্যাখ্যা আছে 'ভারতের সাধিকাতে'। 'মাঝে মাঝে এই পবিত্র স্মারক বস্তুটি যখন খুলে বার করতেন, ভাবতেন, স্বামী তাঁর এখন বহুজনের প্রভু, বহুজনের সংত্রাতা, কিন্তু তবুও বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য তাঁর হৃদয়ের কোণে বিরাজ করছে অকৃত্রিম ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার স্মৃতিকে বার বার তিনি প্রোজ্বল করে তুলেছেন, এই মহামূল্য বার্ষিক উপহারের মধ্য দিয়ে।'

এইভাবে কোথা দিয়ে কাটল পাঁচটি বছর। ষোড়শী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী একুশ উত্তীর্ণা। আগের মলিন, শীর্ণ চেহারা যৌবন লাবণ্যে ভরপুর। মানসিকতায়ও এসেছে অনেক পূর্ণতা। তাঁর অন্তরের ভাব অনেক শান্ত। এর মধ্যেও মনের মধ্যে ক্ষীণ আশা উঁকি দিয়ে যায়—প্রাণবল্লভ কি একবারের

জন্যও নবদ্বীপে এসে তাঁকে দেখা দেবেন না ? উনি তো ভারতভ্রমণ করছেন। ওদিকে নীলাচল থেকে কাকতালীয়ভাবে খবর এল চৈতন্যদেব দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করে নীলাচলে ফিরে এসে অবস্থান করছেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মন অজানা আনন্দে ভরে ওঠে। ভাবেন তাঁর ও স্বামীর সংসার যাত্রা নির্বাহকালের মধুর কথোপকথন। এসব স্মরণে এনেই তাঁর সময় কাটে সাবলীল গতিতে। সেসব দিনকার কথা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্মরণ করে মনে মনে হাসেন। চৈতন্যদেবের ঐশ্বর্য প্রকাশ দেখে বশীভূত না হয়ে তিনি বলেছিলেন—

শুধু মাত্র জানি আমি তোমার চরণ,
পাইয়াছি পতিকৃপা,
বুঝিয়াছি পতিপ্রেম,
শিখিয়াছি পতিসেবা,
কৃষ্ণকৃপা, কৃষ্ণপ্রেম,
কৃষ্ণ-সেবা, সুখানন্দ
অনুভবি ইথে ;
তুমি মোর প্রাণবল্লভ,
তুমি মোর কৃষ্ণ ধন,
তব সেবায় পাই কৃষ্ণ-সেবানন্দ,
তব প্রেমে কৃষ্ণপ্রেম শিক্ষা করি আমি ;
তুমি কৃষ্ণ দরশন চাও,
আমি চাই নিশিদিন তব দরশন।
কৃষ্ণ-সঙ্গ সুখ আশে,
তুমি হয়েছ উন্মত্ত ;
পাগলিনী আমি,
তব প্রেম সুখ-লালসায়।
উন্মত্ত, বিহ্বল তুমি
কৃষ্ণ প্রেম-সুধা-রসে ;
কৃষ্ণ-প্রেম-রসসিন্ধু
উছলি উছলি বহে হৃদয়ে তোমার ;
পতিপ্রেমে পাগলিনী আমি,
পতি প্রেম সুধা-ধারা,
নিরত সিঞ্চিত করে আমার পরাণ ;

তোমাতে আমাতে নাথ!
কিছু ভিন্ন নাই,—নাহি ভেদাভেদ;
তুমি যারে কৃষ্ণপ্রেম বল,
আমি তারে বলি পতিপ্রেম;
তুমি মোর পতি,
দেব দেব পরম ঈশ্বর;
তুমি মোর গতি অন্তঃকালে;
তুমিই মোর কৃষ্ণ, জগতের নাথ,
মোর সম্মুখে বিদ্যমান।
তোমার শ্রীকৃষ্ণ ভজন
আর আমার শ্রীপতি ভজন,
এক বস্তু,—কভু ভিন্ন নহে,
বুঝে দেখ বিচারিয়া, বুদ্ধিমান তুমি।
এস নাথ! হৃদি ভরা প্রেম সিন্ধু দিয়ে,
বুক ভরা ভালবাসা,—
প্রতিদান দিয়ে,
তোমারে ভজিব আমি;
কায় মন বাক্যে,—
সেবিব তোমারে নাথ!
তুষিব তোমার মন সর্ব্বভাবে,
কেন অকারণ দুঃখ কর নাথ।
এস প্রাণেশ্বর! এস হৃদয়েশ!
তুমি মোর কৃষ্ণ,
তুমি প্রাণপতি,
বিষ্ণুপ্রিয়া হবে কৃষ্ণপ্রিয়া,
তব বাক্য হইবে সকল।

[বিষ্ণুপ্রিয়া নাটক—হরিদাস গোস্বামী]

এই স্মৃতিই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে জীবন্ত ও স্বচ্ছন্দ করে রেখেছে। স্বামীর নির্দেশমত ভজন সাধন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যতই করুন না কেন একটি বিষয়ে তিনি নিজের মনকে কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারেন না। সেটি হল, একজন নারী হিসেবে স্বামীর সঙ্গ সুখ পাওয়ার যে তীব্র আকাঙ্খা তা

বিষ্ণুতেই তিনি অন্তর থেকে দূরীভূত করতে পারছেন না।

তবে গৃহত্যাগের সময় গৌরাঙ্গদেব বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে যে কথা বলে প্রবোধ দিয়েছিলেন সেটি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সর্বদাই মেনে চলেছেন। অনুরাগেই তিনি প্রভুকে ডাকেন। স্বামী ভজনাই তো তাঁর কৃষ্ণভজনা। মনশ্চক্ষে স্বামীকে প্রথমে দর্শন করেন। তারপর ধ্যানে বসেন। এ সম্পর্কিত আলোচনায় 'বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত' দেখা যাক: 'এই অনুরাগ—ভজনের ফলে প্রভু শ্রীমতীকে দর্শন দেন, স্বহস্তে দেবীর নয়নজল মুছাইয়া দেন। এ সকল অনুরাগ ভজনের ফল, অতি গুহ্য কথা। ইহা কেহ জানিতে পারে না, শ্রীমতীও কাহারও নিকট বলেন না। এ সকল কথা শ্রীমতীর অতি মর্ম্মসখী কাঞ্চনাকেও বলেন না। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে এইরূপে অনুরাগভজন করিয়া মনে সুখ পান।·········শ্রীমতী এক্ষণে বুঝিয়াছেন শ্রীগৌরাঙ্গ কেবলমাত্র তাঁহার প্রাণবল্লভ নহেন। তিনি নরনারী উভয়েরই স্বামী, অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর।······শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহে থাকিলে শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের মূল উদ্দেশ্য সাধন হইত না। কৃপা করিয়া প্রভুই এই জ্ঞানটি শ্রীমতীকে দিয়াছেন।'

সন্ন্যাস গ্রহণের পাঁচ বছর পর, সন্ন্যাস ধর্মের নিয়মানুসারে জননীও জন্মভূমি দর্শনের জন্য চৈতন্যদেব নবদ্বীপ দর্শনে আসবেন—এ সংবাদ পেয়ে গেলেন শচীমাতা-বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। গ্রীষ্মে তপ্ত গাছ বর্ষাকালে যেমন সবুজ হয়ে ওঠে তেমনি সারা নবদ্বীপবাসী উন্মুখ হয়ে রইলেন তাঁর দর্শনাকাঙ্খায়।

চৈতন্যদেব কাশী থেকে নবদ্বীপ আসছেন। রাঢ়দেশ হয়ে ভাগীরথীর অপরপাড়ে কুলিয়াগ্রামে এসে তিনি উত্তরণ করলেন ৯২২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনের শেষে (১৫১৬খৃীঃ)। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

গঙ্গাস্নান করি প্রভু রাঢ়দেশ দিয়া।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা নগর কুলিয়া॥
পূর্ব্বাশ্রম দেখিব—এ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নবদ্বীপ-নিকটে গেলা এই তার মর্ম্ম॥

চৈতন্যদেব নবদ্বীপের ওপারে কুলিয়া গ্রামে এসেছেন শুনে তাঁকে গঙ্গার এ পার থেকে দেখবার জন্য শচীমাতা নিজে উদ্যোগী হয়ে বৃদ্ধ ভৃত্য ঈশাণ ও বধূমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে দু'হাতে ধরে নিয়ে প্রবল উচ্ছ্বাসে রাস্তার জনসমুদ্রে মিশে গিয়েছিলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন পুত্র সন্ন্যাসী, বধূর

মুখ দর্শন করলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হবে এই ভয়ে হয়ত আগের বারের মত এবারেও গৃহে আসবেন না। তাই শচীমাতার একান্ত ইচ্ছা একবারের জন্যও যদি ভিড়ের মধ্যে থেকেই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে তিনি পতি দর্শন করিয়ে দিতে পারেন তাহলে দোষ কী ? বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যদি স্বামীর অজান্তে তাঁকে দর্শন করেন তাতে কোনও ক্ষতি নেই। আগে কোন রকমে তো স্বামী দর্শন হোক দূর থেকে, এটাই শচীমাতার একমাত্র কাম্য। স্বামীকে সামান্য চোখের দেখা দেখেবেন আশ মেটে না গৌরাঙ্গদেবের বাইশ বছরের যুবতী ভার্য্যা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর। তাঁর ইচ্ছা স্বামী একবার তাঁদের গৃহে আসুন। সেকথা তিনি শাশুড়ীকে খুলেও বলেন। বলরাম দাসের পদে আছে সে উদাহরণ।

লক্ষ লক্ষ লোক হরি ব'লে নাচে,
বুঝি তোর পুত্র ওখানে বিরাজে,
উহু মরি মরি দেখিবারে নারি
এ দুঃখ আমার কহিব কারে।
পাপী তাপী হ'লো শ্রীচরণভোগী,
জগতে বিষ্ণুপ্রিয়া সে বিয়োগী,
দাসীরে দণ্ড দিবার লাগি
এই অবতার।
চল চল মাগো! আমায় নিয়া চল,
লুকাইয়া চল ঝাঁপিয়া অঞ্চল,
ঐ যে দেখা যায় দীঘল অঙ্গ
ঐ ত আমার প্রাণনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ।
সোনার অঙ্গেতে কৌপীন পরেছে,
চিরদিন দুঃখ অবধি পেয়েছে,
তোমার মায়ায় মা আবার এসেছে
বাড়ী ডাকি আন।

লক্ষ লক্ষ লোক কুলিয়া অভিমুখে ছুটল। 'জয় গৌরাঙ্গের জয়' ধ্বনিতে দিগ্বিদিক মুখরিত হল। দুঃখ কি জিনিস সবাই যেন ভুলে গেছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে নারী পুরুষ নির্বিশেষে গৌর দর্শনাকাঙ্খায় ছুটছে। সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাগলিনীর মত এলোচুলে, বস্ত্র আধো খুলে ছুটছেন শচীমাতা। চৈতন্যমঙ্গলে—

প্রভু-আগমন শুনি নদীয়ার লোক।
পুন লেউটিল সবে—পাসরিল শোক ॥ ২৩৩ ॥
হাহা গোরাচাঁদ বলি অনুরাগে ধায়।
কুলবধূ ধায়—তারা পাছু নাহি চায় ॥
বিহ্বল হইয়া শচী ধায় ঊর্ধ্বমুখে।
আউলাইল কেশ—বস্ত্র নাহি দেহ বুকে ॥

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মনেও সুখের জোয়ার, আনন্দের জোয়ার। এবার আত্ম-হারা হয়ে শাশুড়ীর সাথে না ছুটে তিনি গৃহেই রইলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন স্ত্রী হয়ে স্বামীকে দেখতে তিনি ঘরের বাইরে আর পা রাখবেন না। প্রয়োজনে স্বামীকেই তাঁর গৃহদ্বারে এসে দেখা দিয়ে যেতে হবে।

মনের আশা মিটিয়ে সকলে দিব্য কান্তিধর সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবকে দেখছেন। মনের আবেগে শচীমাতা কত কথাই না বললেন পুত্রকে। তাঁর ইচ্ছা—নবদ্বীপে যখন একবার এসেছে নিমাই, এখানেই থেকে যাক। চৈতন্যদেব মাতাকে স্মরণ করান তাঁর কর্তব্যকর্মের কথা। শচীদেবীও এবার পাল্টা বলেন, জননী জন্মভূমি তো দর্শন হয়েছে কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়াতো ঘরে পড়ে আছে। নিমাই'র উচিৎ বধূকে দর্শন দেবার জন্য একবার গৃহে আসা। নিমাই রাজি না হলে বুঝতে হবে পুত্রবধূ ও তিনিই তাঁর জীবনের একমাত্র শত্রু। চৈতন্যদেব মাতার এ হেন অভিমানে আহত হলেন। চৈতন্যমঙ্গলে—

শচী বলে—নবদ্বীপ ছাড়ি যাহ তুমি।'
নবদ্বীপে দুষ্ট বিষ্ণুপ্রিয়া আর আমি ॥ ২৪২ ॥
মায়ের বচনে পুন গেলা নবদ্বীপ।
বার কোণা-ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ ॥

নবদ্বীপে এসে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে চৈতন্যদেব উঠেছিলেন এবং গ্রহণ করেছিলেন প্রসাদ। স্থির হল এবার বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে সশরীরে দর্শন দেবেন তিনি। শ্রীবাস পণ্ডিতঃএ বার্তা বয়ে নিয়ে যান তাঁর গৃহিণীর কাছে। 'বিষ্ণুপ্রিয়া নাটকে'—

গৃহিণী! শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী গৃহে,
এসেছেন নবদ্বীপচন্দ্র।
আজই তিনি,
জননী ও জন্মভূমি করি দরশন,
ছাড়িবেন নবদ্বীপ চিরতরে।

করযোড়ে ক'রে বহু অনুরোধ,—
তিন দিন ধ'রে, - ক'রে বহু আরাধনা,
বহু কষ্টে ক'রেছি সম্মত তাঁহাকে
দাঁড়াইতে গৃহদ্বারে,—অর্দ্ধ দণ্ড তরে।
হেরিবেন পতি পাদপদ্ম,
শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া সতী।
এই ভার লহ তুমি ;—
করি পরামর্শ শচীমার সনে—
কার্য্য যাতে হয় সুসম্পন্ন,
কর তুমি সুব্যবস্থা তার।
যাই আমি প্রভুর নিকটে
সঙ্গে করি তাঁরে আনিব হেথায়।

পত্নী মালিনীদেবীকে একা ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দিলে হবে না। তিনি না হয় ঘরের ভেতরটা সামলাবেন। কিন্তু বাইরেটা সামাল দেবে কে ? চৈতন্যদেব তো আর একা দর্শন দিতে আসতে পারবেন না। তাঁর পেছনে এখন জন সমুদ্রের ঢেউ। সে ঢেউ আছড়ে পড়বে শচী আঙ্গিনায়। তাই শ্রীবাস পণ্ডিত বহির্দ্বার সামলাবার দায়িত্ব দেন বৃদ্ধ ঈশাণের উপর—

এখন বলি শুন,—
আসিবেন প্রভু আজ গৃহদ্বারে
জননী ও জন্মভূমি দরশনে।
যাহাতে বধূ ঠাকুরানীর তব
পতি পাদপদ্ম স্বচ্ছন্দে হয় দরশন ;
তাহার সম্পূর্ণ ভার তোমার উপর।
যাও ঈশাণ। মার সনে করি পরামর্শ—
বুঝিয়া,—সময় ও সুযোগ—
কর এই কার্য্য সমাধান। [ঐ]

এদিকে পতির দর্শন অপেক্ষায় থাকা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কানে এ শুভ সংবাদ এসে পৌঁছয়নি। অথচ চারিদিকে নানা শুভ চিহ্ন দেখে আনন্দে তাঁর শরীর কেমন থরথর করে কাঁপছে। স্বামী সন্ন্যাসে যাবার আগে তিনি দেখেছিলেন নানা অমঙ্গল চিহ্ন। সে যাত্রা সব মিলে গিয়েছিল। এবারও শুভ চিহ্নের পরিণতি তিনি বুঝে গেছেন। তাই সখী কাঞ্চনাকেই জিজ্ঞাসা

করেন সরাসরি, স্বামী গৃহদ্বারে এসে দাঁড়ালে তাঁর কর্তব্য কি হবে? পদকর্তা বলরাম দাসের পদে—

কি লাগি বল না আনন্দ ধরে না
অঙ্গ কাঁপে থরথর।
চারিদিকে সখি শুভ চিহ্ন দেখি
বুঝি এল প্রাণেশ্বর।
আঙ্গিনায় দাঁড়াবেন হরি। ধ্রু।
ঘোমটা টানিব দ্রুত ঘরে যাব
রুণু রুণু রব করি।
ঘরে লুকাইয়া শ্রীমুখে চাহিয়া
দেখিব পরাণ ভরি।
দেখিবারে মোরে উঁকি বারে বারে
মারিবেন গৌরহরি।
নয়নে নয়ন হইলে মিলন,
বল কি করিব সখি।

চৈতন্যদেব অনাবৃত দীঘল দেহ নিয়ে দণ্ডকমণ্ডলু হাতে অরুণ কৌপীন পরে নিজের পূর্বাশ্রমের একটি কোণে দাঁড়ালেন। লক্ষ লক্ষ ভক্ত চারিদিক থেকে তাঁকে ঘিরে আছে। শচীদেবী ছুটে এসে পুত্রের হাত ধরলেন। নিমাই'র মোহিনীরূপ দেখে মায়ের আনন্দাশ্রু বয়ে যাচ্ছে। কখন বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী লজ্জার বন্ধন ছিন্ন করে, ঝরে পড়া ফুলের মত টুপ করে চৈতন্যদেবের পদতলে পড়লেন! উপস্থিত জনসমুদ্র থেকে সমবেত কণ্ঠে গৌর পরিবারের নামে জয়ধ্বনি উঠল।

জয় জয় মহাপ্রভু জয় গৌরচন্দ্র।
জয় বিশ্বম্ভর জয় করুণার সিন্ধু॥
জয় শচীসুত জয় পণ্ডিত নিমাঞি।
জয় মিশ্র পুরন্দর জয় শচী আই॥
জয় জয় নবদ্বীপ জয় সুরধুনী।
জয় লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর গৃহিনী॥

এই যে গৌরাঙ্গ দেবকে নিজ গৃহদ্বারে দণ্ড কমণ্ডলু হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াতে হয়েছে এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় 'বিষ্ণুপ্রিয়া চরিতে'। 'শ্রীগৌরাঙ্গের মনের ভাব অন্যরূপ। তিনি প্রিয়াকে না দেখিয়া নবদ্বীপ

ছাড়িতে পারিতেছেন না। তাই জননীর নিকট বলিয়াছেন গৃহদ্বারে তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন। শ্রীগৌর ভগবান ভক্ত বৎসল, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী তাঁহার শ্রেষ্ঠা ভক্ত; প্রীতি ভজনে শ্রীগৌর ভগবানকে প্রেম সূত্রের চির বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।'

নিরুদ্বেগ স্বরে চৈতন্যদেব বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দিকে চোখ নামিয়ে বললেন, তুমি কে?' বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মুখের ও মনের আগল খুলে যায়। কান্না বিজড়িত কণ্ঠে নিজের পরিচয় দিয়ে প্রকাশ করেন সমস্ত অভিমান। 'বিষ্ণুপ্রিয়া নাটকে'—

ওহে জগতের নাথ!
দয়ার সাগর তুমি, করুণার অবতার।
এ দাসীর প্রতি,
করেছ তুমি করুণা প্রচুর।
দিয়ে দরশন নিজ গুণে,
কৃতার্থ করিলে মোরে।
ভিখারিণী আমি,—কাঙ্গালিনী আমি,—
ভিক্ষা চাই তব কাছে
কৃপা নিদর্শন কিছু তব দাও প্রভু,
এ অধিনীরে;
দগ্ধ জীবনের এখনও বহুদিন
আছে বাকি,—
তব দত্ত কৃপা-নিদর্শন করিয়া সম্বল—
ভজিব তোমারে আমি,
তব গৃহে বসি।

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মর্মস্তুদ ক্রন্দনের ঢেউ উপস্থিত জনদের হৃদয় আলোড়িত করল। চৈতন্যদেব একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে নিজের কাষ্ঠপাদুকা পা থেকে খুলে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অচলা ভক্তির স্বীকৃতি স্বরূপ দু'হাতে নিয়ে উপহার দিলেন। আঁচল পেতে গ্রহণ করে তা মাথায় তুলে নিলেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। চৈতন্যদেব নির্দেশ দিলেন শুদ্ধ মনে গৃহে গিয়ে এই পাদুকার নিত্য পূজা করে শান্তি লাভ কর। 'চৈতন্যতত্ত্ব দীপিকায়' বলা হয়েছে—

মৎপাদুকে গৃহীত্বাথ গৃহিণি যাহি তে গৃহং।
স্বর্ণাঙ্গিকে ইমে পূজ্যে সদা শুদ্ধে শুচিস্মিতে॥

আর দাঁড়ালেন না চৈতন্যদেব। এবার নীলাচলের উদ্দেশে যাত্রা। 'শচীমার কান্নায় কেঁদে উঠলো গঙ্গার দুই তীর, বিষ্ণুপ্রিয়ার নীরব অশ্রুজলে ভিজে গেল নবদ্বীপের মাটি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর গৃহে ফিরলেন না।' (ঠাকুর শ্রীশ্রীনরোত্তম—শ্রীসমরেন্দ্র)

চৈতন্যদেব প্রদত্ত পাদুকাই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে দিয়েছিল নতুন জীবনের সন্ধান। কেননা এই প্রথম তিনি এমন একটি অবলম্বন পেলেন যা নাকি স্বয়ং চৈতন্যদেব হাতে করে তাঁকে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সখী কাঞ্চনাকে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বলেছেন—

সখি কাঞ্চনে!
ভজন সাধন আমি কিছু নাহি বুঝি,
... ...
কৃপানিধি তিনি,
কৃপা ক'রে দিয়েছেন মোরে
তাঁর চরণ কমল-পৃষ্ঠ কাষ্ঠ পাদুকা দু'খানি,
ইহা শুধুমাত্র কৃপা নিদর্শন তাঁর।
এই মোর সাধনার ধন, জীবন সম্বল।

[বিষ্ণুপ্রিয়া নাটক]

গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার অবতরণের কারণ কাঞ্চনার জানা। তাই কাঞ্চনাও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে স্মরণ করান—

ষড়ৈশ্বর্য্য মধ্যে বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য তাঁর,—
শাস্ত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে।
দেখাইতে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যের সীমা
তোমা সনে সখি!
তাঁর এই পদুকা-দান লীলা অভিনয়।
তুমিও ত সখি! হ'য়ে সর্ব্বত্যাগী,
ধরাসন করেছ সম্বল।
অনাহারে,—অনসনে,—রাত্রিদিন,
করিছ নিশিদিন হাহাকার!
মহাবৈরাগ্যবান সন্ন্যাসী পতিধন তব,
তুমিও সখি, মহা বিরাগিনী সন্ন্যাসিনী,
একই ভাবে,—দুই জনে,

দেখাইলেছ, বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য,
জীবের শিক্ষার তরে। [ঐ]

সখি কাঞ্চনার মুখে 'দেবদেবী মহিমা তত্ত্ব' এ সময়ে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর শুনতে ভালো লাগে না। স্বামীর নগ্নপদের কথা ভেবে একজন মানবিক গুণ সম্পন্ন নারীর মতই তিনি বলেন—

কিন্তু সখি, একটি কথা হ'লে মনে
মনে বড় পাই দুখ,– বুক ফেটে যায়,—
কুক্ষণে মাগিনু ভিক্ষা আমি,
তাঁর কাছে,—তাঁর কৃপার নিদর্শন ;
জঞ্জাল বলিয়া তিনি,
ত্যজিলেন মোর বাক্যে চরণ পাদুকা।
... ...
দেশে দেশে পর্ব্বতে গহনে
কঠিন প্রস্তর ও কণ্টকাকীর্ণ
জন মানবের অগম্য পথেতে,
গুণনিধি গুণমণি মোর,
এবে নগ্নপদে করিবেন ভ্রমণ।
আহা! বড় ব্যথা বাজিবে তাঁর
রাঙ্গা উৎপল কোমল চরণতলে।
পাইবেন তিনি কত কষ্ট ;
স্বার্থপর আমি — [ঐ]

এই যন্ত্রণাবোধ থেকেই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্বামীর কোমল রাতুল চরণ রক্ষা করার জন্য নবদ্বীপ থেকে নীলাচলে একজোড়া নতুন পাদুকা পাঠিয়েছিলেন পণ্ডিত জগদানন্দ মারফত। সে পাদুকা পুরীর গম্ভীরা গৃহে আজও দর্শনার্থীদের জন্য রক্ষিত আছে। ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের 'কাঁহা গেলে তোমা পাই' গ্রন্থ থেকে এ প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাক। 'তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন গম্ভীরা গৃহটির সামনে··· বললেন—এই যে কাষ্ঠ পাদুকা দেখছ, এ দুটি পাঠিয়েছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া নবদ্বীপ থেকে। ভক্তবৎসল গৌরহরি শ্রীজগদানন্দের অনুরোধে পদসংলগ্ন করেছিলেন এই পাদুকা যুগলে শেষ পর্যন্ত।'

এখানে খুব একটা প্রাসঙ্গিক না হলেও উল্লেখ্য, চৈতন্যদেব প্রদত্ত চরণ

পাদুকাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কাছে নিত্যপূজার বিষয় হয়ে উঠেছিল। প্রায় ৪৮০ বছর বয়স হতে চললেও সেই পবিত্র ঐতিহাসিক পাদুকাখানি আজও নবদ্বীপের ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরের সিংহাসনে রাখা আছে। প্রতিদিন ঐ পাদুকার সেবা-পূজা করে চলেছেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বংশধরেরা। সাধারণ ভক্তবৃন্দ দর্শন করেন পাদুকা, এমন কি দক্ষিণার বিনিময়ে স্পর্শ করতে ও মস্তকে ধারণ করতে পারেন। ভক্তদের বাড়ীতেও পাদুকা পাঠানো হয়। অবশ্য জীর্ণ মূল পাদুকাটি সংরক্ষণের জন্য রূপো নির্মিত দুটি ফাঁপা পাদুকার ভেতর চাবি বন্ধ অবস্থায় রক্ষিত আছে। বৈষ্ণব ভক্ত ও সাংবাদিক তরুণ কান্তি ঘোষ পাদুকাটির জন্য এই সুবন্দোবস্ত করেছেন বলে জানা যায়। গবেষণার প্রয়োজনে মূল পাদুকাটি 'বিষ্ণুপ্রিয়া সমিতি'র সম্পাদক মহাশয়ের অনুমতিক্রমে দেখা যেতে পারে। অবশ্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে আগে লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে সম্পাদক মহাশয়ের কাছে। সম্প্রতি নবদ্বীপের 'মালঞ্চ পাড়ায়' আবিষ্কৃত হয়েছে 'বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্মভিটা'। বর্তমানে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মদিন এখানেই পালিত হচ্ছে।

শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে শেষ দেখা দিয়ে চৈতন্যদেব নীলাচলে ফিরে যাবার পরই শচীমাতার শোকাগুণ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। তাঁর তাপিত শরীর মন ক্রমশঃ ভেঙে পড়তে থাকে। শাশুড়ীর এ অবস্থা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ক্রমাগত শঙ্কা বৃদ্ধি করে। তিনি আক্ষেপ করেন পুত্র হয়ে মায়ের কিছুই ভালোমন্দ দেখতে হচ্ছে না তাঁকে। 'বিষ্ণুপ্রিয়া নাটকে'—

জননীর শেষ দশা,
বৃদ্ধ জরাজীর্ণ কঙ্কালময় দেহ যষ্টি তাঁর,
যেন দগ্ধ কাষ্ঠ একখানি,—
মাসের মধ্যে বিশদিন,
উপবাসে দিন যায় যাঁর,—
এ দৃশ্য,—
দেখিতে হ'ল না পুত্রের তাঁর,—
ভাগ্যবান তিনি,—
পুত্র-বিরহ-দগ্ধ জননীর তপ্ত দীর্ঘশ্বাস,

পুত্র পাগলিনীর সকরুণ বিলাপোক্তি,
পুত্র বিরহাকুলা জননীর করুণ আর্ত্তনাদ
কিছুই,—দেখিতে, শুনিতে, বা সহিতে
হল না তাঁর।

চৈতন্যদেব কিন্তু অন্তর্যামী। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আকুল বেদনা মরমে মরমে উপলব্ধি করেন তিনি। নীলাচলে বসেই শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সেবা করার জন্য তিনি বংশীবদনকে আদেশ পাঠালেন। বংশীবদন সে ভার সানন্দে মাথায় তুলে নিল। চৈতন্যদেবের গৃহে এসে সে প্রথম শরণাপন্ন হল গৃহভৃত্য বৃদ্ধ ঈশানের। 'বংশীশিক্ষায়' বলা হয়েছে বংশীবদন করজোড়ে জানাল—

মহাপ্রভু এই আজ্ঞা করিলা আমায়।
সেবিতে মাতায় আর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায় ॥

বংশীবদন আসাতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী মনে যেন অনেকটা বল পেলেন। এখন শাশুড়ির সেবাযত্ন আরো ভালো করে করতে পারছেন। বংশীবদন ও ঈশাণ মিলেমিশে ভাগাভাগি করে শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সেবা পরিচর্যা করে। সংসার রক্ষণাবেক্ষণ কর্ম ও খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করে তারা। 'বংশী-শিক্ষায়'—

প্রভু আজ্ঞা অনুসারে ঈশান বদন।
করিতে লাগিলা উভয়ের সুসেবন ॥

এরপর আবারও, চৈতন্যদেবের নবদ্বীপের বাড়ির পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পাকাপাকিভাবে নিয়ে নীলাচল থেকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধর বয়স্ক পণ্ডিত দামোদর নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী জানলেন চৈতন্যদেব প্রেরিত পণ্ডিত দামোদর আসলে তাঁর জীবনে একটি সূক্ষ্ম বিধিনিষেধের বেড়া বেঁধে দিতে চান। এর আগে প্রতিবছরে একবার কি দুবার তিনি নীলাচল থেকে নবদ্বীপে এসেছেন সংবাদ আদান প্রদানের জন্য। সে সময় নীলাচলে চৈতন্যদেবকে সবসময় দেখাশোনা করতেন তিনি। ভাবে বিভোর চৈতন্যদেবের আচরণে কোনো ত্রুটি দেখলে সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুলি সঙ্কেতে অথবা তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে তা স্মরণ করিয়ে দিতেন। চৈতন্যদেবের ভুল ত্রুটি দেখতে পারেন বা তা স্বমুখে উচ্চারণ করতে পারেন এমন সাহস নীলাচলে দামোদর পণ্ডিত ছাড়া আর কারো ছিল না। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। একবার এক ওড়িশি পিতৃহীন ব্রাহ্মণ বালকের ওপর যুবক

সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবের অতিরিক্ত সদয়তা দেখে দামোদর তাতে বাধ সেধে-ছিলেন। চৈতন্যদেবকে তিনি অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে বালকটির প্রতি তাঁর স্নেহ দূর করতে বাধ্য করেছিলেন। উল্লেখ্য, বালকটির মাতা ছিল পরমা-সুন্দরী বিধবা যুবতী। এই যুবতী রমণীর পুত্রের প্রতি চৈতন্যদেবের অতিরিক্ত স্নেহকে দুষ্টজনেরা কুচোখে দেখলে প্রভুর ঐশ্বরীয় মর্যাদার হানি ঘটবে বলে কড়া মন্তব্য করেছিলেন দামোদর। চৈতন্যদেব এই ঘটনার পর দামোদরকেই কষ্টিপাথর হিসেবে পেয়ে 'পরম বান্ধব' আখ্যা দিয়ে সোজা নবদ্বীপে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, আরও অনেক কম বয়সী সাধিকা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকেও এই একইভাবে শৃঙ্খলার নিগড়ে আগলিয়ে রাখার জন্য অভিভাবক হিসেবে প্রয়োজন শুধুমাত্র দামোদরকেই। পদকর্তা বলরাম দাসের পদে নবীনা সাধিকার কথা—

বিষ্ণুপ্রিয়া নববালা, হাতে ল'য়ে জপমালা
রুই রুই জপে গৌর নাম।
নবীনা যোগিনী ধনি, বিরহিণী কাঙ্গালিনী,
প্রণময়ে নীলাচল ধাম ॥
সর্ব্ব অঙ্গে মাখা ধুলা লম্বাকেশ এলোচুলা,
সোনার অঙ্গ অতি দুরবল।
বলরাম দাস কয়, শুন প্রভু দয়াময়
মুছায়ে দাও দেবী আঁখি-জল ॥

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সাধিকা জীবনে অপরিহার্য ছিলেন দামোদর। 'ভারতের সাধিকাতে' দেখি—'বিষ্ণুপ্রিয়ার তীব্র বিরহ সাধনার কথা, বিরহ অগ্নিময় পঞ্চতপার কথা, অন্তর্যামী প্রভু শ্রীচৈতন্য জানতেন। আরো জানতেন তাঁর এই তপস্যার ক্রমিক সিদ্ধির কথা। কিন্তু সব জেনেও প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়ার বহিরঙ্গ জীবনের চারধারে সতর্ক হস্তে তুলে দিয়েছিলেন কঠোর নিয়ন্ত্রণের অনড় প্রাচীর।

এমনি প্রাচীর দিয়ে নিজের সন্ন্যাস জীবনকেও বেষ্টন ক'রে নিয়েছিলেন প্রভু। নারী সান্নিধ্য বা নারী সম্ভাষণ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন তিনি। বলা বাহুল্য, বিষ্ণুপ্রিয়া ও তাঁর নিজের সম্পর্কিত এই নিয়ন্ত্রণের মূলে ছিল লোক-শিক্ষাদান। গোপীপ্রেম সাধনার পথে যারা আসবে, তারা সমস্ত কামনা-বাসনার বীজকে দগ্ধ ক'রে আসবে, এই ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক উপদেশের নির্যাস। আর সেই জন্যেই কঠোর নিয়ন্ত্রণের

নিগড়ে নিজেকে এবং নিজের ভক্ত শিষ্যদের বেঁধে নিয়েছিলেন তিনি।...

বলা বাহুল্য, জননীর নাম ক'রে বললেও তরুণী ভার্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাঁর আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণের কথাটিই ছিল শ্রীচৈতন্যের আসল উদ্দেশ্য। তিনি জানতেন, নবদ্বীপে তাঁর গৃহে সতত হাজির রয়েছেন ভক্ত বংশীবদন আর তাঁর চিরবিশ্বস্ত বর্ষীয়ান গৃহভৃত্য ঈশান। তাছাড়া, শ্রীবাস প্রভৃতি স্থানীয় বৈষ্ণব ভক্তেরা সদাই জননী শচীদেবীর আদেশ পালনে যত্নবান। প্রয়োজন হলে জীবন বিসর্জন দিতেও তাঁরা উৎসুক। দেখাশুনা করার লোকের কোনো অভাব সেখানে নেই, অভাব রয়েছে এমন একজন কঠোর ন্যায় নীতিনিষ্ঠ তত্ত্বাবধায়কের যার ভ্রূ ভঙ্গীতে সবাই ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে, সংযত করে রাখবে তাদের আচার আচরণ।

দামোদর পণ্ডিত ছাড়া এমন ব্যক্তি আর কে আছে? তাই প্রভু তাঁর ওপরই সেদিন ন্যস্ত করলেন নবদ্বীপের গৃহের সমস্ত কিছু সামাজিক দায়িত্বের ভার।'

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সাংসারিক জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে 'পরমাপ্রকৃতি বিষ্ণুপ্রিয়ায়' বলা হয়েছে—'ধনী সনাতন মিশ্রের একমাত্র কন্যা হয়েও বাবা-মার অত্যধিক স্নেহ সমাদরে তিনি কখনো নিজ কর্তব্যে উদাসীন হননি। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীর অন্তরটিকে তিনি এমনভাবে চিনে নিয়েছিলেন যে স্বামীর জগৎকল্যাণ ব্রতে তাঁর নিজেরও একটি স্থান তিনি আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হলো—আদর্শ গৃহিণীর মতো গৃহকার্যের দায়িত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেও স্বামীর বৃহত্তম কর্মে অংশগ্রহণ করে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করতেন। তাই বিষ্ণুপ্রিয়া হয়ে উঠলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রিয়া। আদর্শ গৃহিণী হয়েও নারীদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তৃতি দ্বারা নীরব সাধনায় সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেন।

'নারীর কর্তব্য সব করিয়া পালন।
জগতের নারীবৃন্দে করান শিক্ষণ॥''

চৈতন্যদেব যেমন নীলাচলে বসে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন তেমনি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও চৈতন্যদেবের সঙ্গে নবদ্বীপের গৃহে বসেই যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন বলে বৈষ্ণব ভক্ত গ্রন্থাদিতে জানা যায়। 'বিষ্ণুপ্রিয়া চরিতে'—'বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আদেশে শচীমাতার অনুমতি লইয়া কাঞ্চনা একবার নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। প্রতি বৎসরই নবদ্বীপ হইতে অনেক নরনারী প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে যাইতেন।

সেই সঙ্গে কাঞ্চনাও গিয়াছিলেন। দামোদর পণ্ডিত সঙ্গে ছিলেন। সখীর প্রতি দেবীর আদেশ ছিল, তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া আসিবেন। শুধু সাক্ষাৎ করিলে হইবে না, দেবীর পক্ষ হইতে প্রভুকে দুই একটী দুঃখের কথা বলিয়া আসিতে হইবে।'

অল্প দিনের মধ্যেই শচীদেবীর শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটল। ওই অবস্থাতেই অবিরাম পুত্রের নাম জপ করে চলেছেন তিনি। 'বিষ্ণুপ্রিয়া নাটকে' দেখি ঘোরের মধ্যে শচীমাতা বলে যাচ্ছেন—

পরাণ গৌরাঙ্গ আমার,
(ঐ) নেচে চলে যায় ॥
(তোরা) দেখবি যদি আয়।
প্রেমেতে পাগল পারা,
জীবদুখে কাঁদে গোরা,
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে
(পুনঃ) ধরাতে লুটায়

সোনার গৌরাঙ্গ বলে
আয় সবে আয়
(গৌর আমার বলে রে)
হরে কৃষ্ণ হরে রাম,
বল্‌রে মুখে অবিরাম,
পরমায়ু অল্প জীবের
সময় ব'য়ে যায়।

শচীমায়ের অন্তিম অবস্থার সংবাদ পেয়ে গোটা নবদ্বীপের লোক চৈতন্যদেবের বাড়িতে ভিড় করল। হরি সংকীর্তনের মাধ্যমে গৌরবন্দনা চলল। এ সময় বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর একমাত্র কাজ ছিল সবসময়ই শাশুড়ির কাছে বসে থাকা। অবশেষে শেষ অবস্থা উপনীত হলে শচীমায়ের ইচ্ছানুযায়ী দিব্যযানে ফুল সাজিয়ে শচীমাতাকে নিয়ে যাওয়া হল গঙ্গার তীরে। দোলায় চড়ে মুখ বস্ত্রাবৃত করে সঙ্গে সঙ্গে চললেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শেষ বিদায়ের ক্ষণে শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। এ সময় নাকি গৌরাঙ্গদেব 'রসরাজ মূর্তিতে' শেষ দর্শন দিয়েছিলেন জননীকে। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সেই মূর্তি দেখে মূর্ছা গিয়েছিলেন। 'বিষ্ণুপ্রিয়া

চরিতে' আছে এর সমর্থন। 'ভক্তবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে কান্দিতে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ অলক্ষ্যে আসিয়া রসরাজ-মূর্ত্তিতে জননীকে শেষ দর্শন দিয়া গেলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী প্রাণবল্লভের রসরাজ-মূর্ত্তি দেখিয়া গঙ্গাতীরেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।'

চৈতন্যদেব জননী শচীমাতাকে একদিন বলেছিলেন—

সকল পবিত্র করে যে গঙ্গা তুলসী।

তানাও হবেন ধন্য তোমারে পরশি ॥— [চৈতন্য ভাগবত]

শচীমায়ের ইহজগত থেকে বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই সংসারে একাকিনী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কঠোরতম ভজন সাধনার প্রকৃত শুরু বলা চলে। এতদিন তাঁর সংসারের শেষ গ্রন্থি শাশুড়ি বর্তমান থাকায় ঘরের বধূ হিসেবে নানা দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। স্নেহশীলা, পরম মমতাময়ী শাশুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক কাজ করেছেন তিনি। কিন্তু এখন স্বামীর গোষ্ঠীর আর কেউ রইল না ঘরে। অতএব বাধা দেবার মত কেউ না থাকায় বিলাস ব্যসন চিরতরে ত্যাগ করে গ্রহণ করলেন ব্রহ্মচর্য। শুরু হল নিরলস গৌরভজন। 'অদ্বৈত প্রকাশে' দেখি—

—'বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা শচীদেবীর অন্তর্ধানে।
ভক্তদ্বারে দ্বার রুদ্ধ কৈলা স্বেচ্ছাক্রমে ॥
তাঁর আজ্ঞা বিনা তানে নিষেধ দর্শনে।
অত্যন্ত কঠোর ব্রত করিলা ধারণে ॥
প্রত্যুষেতে স্নান করি কৃতাহ্নিক হঞা।
হরিনাম করি কিছু তণ্ডুল লইয়া ॥
নাম প্রতি এক তণ্ডুল মৃৎপাত্রে রাখয়।
হেন মতে তৃতীয় প্রহর নাম লয় ॥
জপান্তে সেই সংখ্যার তণ্ডুল মাত্র লঞা।
যত্নে পাক করে মুখ বস্ত্রেতে বান্ধিয়া ॥
অলবন অনুপকরণ অন্ন লইয়া।
মহাপ্রভুর ভোগ লাগান কাকুতি করিয়া ॥
বিবিধ বিলাপ করি দিয়া আচমনী।
মুষ্টিক প্রসাদ মাত্র ভুঞ্জেন আপনি ॥
অবশেষে প্রসাদান্ন বিলায় ভক্তেরে।
ঐছন কঠোর ব্রত কে করিতে পারে।'—

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ব্রহ্মচর্যকালীন দিনাতিপাতের বর্ণনা পাই, 'শ্রীগৌরহরির অত্যদ্ভুত চমৎকারী ভৌমলীলামৃত (নবদ্বীপ বিলাস)' গ্রন্থে। এখানে বলা হয়েছে—'শ্রীশ্রীগৌরবিশ্বম্ভরের প্রেমভক্তি-স্বরূপিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তদাভিন্নবিগ্রহ স্বয়ং গৌর সুন্দরই। তাঁহার কৃপার লেশমাত্র-লাভ হইলেই জীব ধন্যাতিধন্য হন, তাঁহার শ্রীগুরু বৈষ্ণবানুগত্যে নামভজনে নিষ্ঠা বর্দ্ধিত হয়। তিনিই শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-লীলায় নামভজন—শিক্ষা-দাত্রী আদর্শ আচার্য্য। তিনি ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর নাম উচ্চারণান্তে একটি তণ্ডুল রক্ষা করিয়া যে কয়টি তণ্ডুল হইত, তাহা রন্ধন করিয়া মহাপ্রভুকে ভোগ দিয়া সেই প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। প্রসাদ গ্রহণকালেও বিপ্রলম্ভের সহিত নাম গ্রহণ করিতেন। এইরূপ তাঁহার দিবারাত্র নাম ভজনে অতিবাহিত হইত।'

চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করার পর থেকে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্বামীর ব্যবহৃত যাবতীয় সামগ্রী, এমনকি শয্যা, পালঙ্কটি পর্যন্ত সযত্নে রক্ষা করে এসেছেন। এখন আর একটি বড় অবলম্বন ও কর্তব্য হয়েছে তাঁর। স্বামী প্রদত্ত চরণ পাদুকা পূজার মাধ্যমেই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সখীগণসহ এক ভক্তমণ্ডলী গড়ে তুলতে সক্ষম হলেন। ইতিমধ্যে বংশীবদনকে মন্ত্রশিষ্য করে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী আচার্য্যার আসনে আসীন হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে গৌরাঙ্গ-দেবের আদর্শকে সামনে রেখে পরোক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী মহাপ্রচারকরূপে ব্রতী হলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কঠোর ভজনের ফলে নবদ্বীপের রমণীরাও দলে দলে যোগ দিয়েছিলেন গৌর আরাধনা যজ্ঞে।

'শচীমাতার জীবিতাবস্থায় প্রভুর গৃহের বাইরের দ্বার খুলে রাখা হতো, কারণ ভক্তেরা প্রভু জননীকে প্রণাম নিবেদন করতে আর তাঁর খোঁজ খবর নিতে আসতেন। তাঁর তিরোধানের পর নিজের বহিরঙ্গ জীবনের ওপর বিষ্ণুপ্রিয়া টেনে দিলেন এক কৃষ্ণ যবনিকা।

শুধু খিড়কির দুয়ারটি রইল খোলা। এই দুয়ার দিয়ে পূর্ব অভ্যাস মতো শেষ রাত্রে একবার তিনি বহির্গত হতেন পুণ্যতোয়া গঙ্গায় অবগাহন করতে। সঙ্গে থাকতো বৃদ্ধ ভৃত্য ঈশাণ এবং ভক্ত প্রবর বংশীবদন। স্নান-তর্পণ শেষে ঠাকুর ঘরে গিয়ে তিনি বসতেন প্রভুর কাষ্ঠ পাদুকার সম্মুখে। প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত করতেন ভজন-পূজনে ও মানসলীলা দর্শনে।'

[ভারতের সাধিকা]

শচীমাতার মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই গৃহভৃত্য ঈশাণ দেহ রাখল।

সর্বক্ষণের একজন মরমী সেবককে হারিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দুঃখ বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। তিনি এসব ভুলতে আরও উচ্চমার্গীয় সাধনায় প্রবেশ করেন। দামোদর পণ্ডিত মারফত বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কঠোর ভজন সাধনার কথা নীলাচলে চৈতন্যদেবের কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল। 'অদ্বৈত প্রকাশ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক—

—যে কষ্ট সহেন মাতা কি কহিমু আর।
অলৌকিক শক্তি বিনা ঐছে শক্তি কার॥
তাহা শুনি মোর প্রভু করয়ে ক্রন্দন।
কৃষ্ণ ইচ্ছা মানি করে খেদ সম্বরণ॥

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর এ হেন কঠিন সাধনার খবর পাবার কিছুদিন আগেই চৈতন্যদেব মাতার বিয়োগ সংবাদ পেয়েছেন। মাতৃবিয়োগে মনে ব্যথা পেয়েছিলেন তিনি। এবার পেলেন আরও কঠিন দুঃখ। যদিও বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর এই উচ্চমার্গীয় সাধিকা রূপটিই তাঁর একান্ত অভিপ্রেত ছিল। তিনি বুঝে নিলেন এবার তাঁরও স্বধামে যাবার সময় হয়েছে। প্রয়োজন নেই আর বেঁচে থাকার। তাছাড়া একে একে আসছে প্রিয়জন হারানো সংবাদ। ঈশানের মৃত্যুও তাঁর কর্ণগোচর হয়েছে। এবার তাঁরও বিদায় প্রস্তুতির পালা। 'বিষ্ণুপ্রিয়া চরিতে'—

'প্রভু শুনিলেন, তাঁহার প্রাণপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন। মনে দারুণ ব্যথা পাইলেন। নিদারুণ মনঃকষ্টে প্রভু নীলাচলে বসিয়া এই সময় কঠোর হইতে কঠোরতম শ্রীকৃষ্ণ-ভজন আরম্ভ করিলেন। প্রভু মনে মনে ভাবিলেন, এতদিনে তাঁহার নদীয়ার লীলা সাঙ্গ হইল। এত আদরের প্রেমময়ী প্রাণপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে সন্ন্যাসিনী সাজাইলেন! তাঁহার নরলীলা পূর্ণ হইল।......কলিহত জীবের মঙ্গলের জন্য তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ, জীবশিক্ষার জন্যই তাঁহার দীন-হীন-বেশে এই কঠোর সাধনা। লোকশিক্ষার জন্যই তাঁহার ভক্তবেশ। ...তাঁহার সাধ্বী ঘরণী লোকশিক্ষার জন্য প্রাণবল্লভের পথানুসরণ করিলেন দেখিয়া পতিতপাবন দয়াল প্রভু আমার নিশ্চিন্ত হইয়া অপ্রকট হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা এতদিনে পূর্ণ হইল।'

নীলাচলধামে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ৯৩৯ বঙ্গাব্দের ৩১শে আষাঢ় (১৫৩৩ খ্রীঃ) তাঁর ইহলীলা সাঙ্গ করলেন। যোগ্যতমা উত্তরসূরী হিসেবে নবদ্বীপ ধামে রেখে গেলেন সাধিকা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে। নীলাচল থেকে মহাপ্রভুর অপ্রকট হবার সংবাদ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল নবদ্বীপেও। বহু ভক্ত এ

সংবাদে মূর্ছিত হলেন। কেউ কেউ প্রাণত্যাগও করলেন। আর মাত্র ৩৮ বছর ৫ মাস বয়সে বৈধব্যকে বরণ করলেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। নতুন করে পাগলিনী হবার অবস্থা তাঁর। শেষ আশার দীপটিও যে নিভে গেল। বন্ধ হয়ে গেল খিড়কির দুয়ার। প্রতিজ্ঞা করলেন পুরুষদের মুখও আর তিনি দর্শন করবেন না। 'অনুরাগবল্লীতে' আছে—

—প্রভু অপ্রকটে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরানী।
বিরহ-সমুদ্রে ভাসে দিবস রজনী ॥
বাড়ীর ভিতর দ্বার মুদ্রিত করিয়া।
ভিতরে রহিল দাসী জনা কথো লৈয়া ॥
দুই দিগে দুই মই ভিতে লাগা আছে।
তাহে চড়ি দাসী আইসে যায় আগে পাছে ॥
ভিতরে পুরুষ মাত্র যাইতে না পায়।
দামোদর পণ্ডিত যায় প্রভুর আজ্ঞায় ॥
পণ্ডিতের অদ্ভুত শক্তি অদ্ভুত প্রকৃতি।
মহাপ্রভুর গুণে নিরপেক্ষ যাঁর খ্যাতি ॥
কদাচ কেহ করে অল্প মর্যাদা লঙ্ঘন।
সেই ক্ষণে দণ্ড করে মর্যাদা স্থাপন ॥
নিরবধি প্রেমাবেশ যাঁহার শরীরে।
হেন জন নাহি সে সংকোচ নাহি করে ॥
গঙ্গাজল ভরি দুই ঘট হস্তে লইয়া।
সেই পথে লঞা যায় নিলক্ষে চলিয়া ॥
প্রত্যহ সেবার লাগি লাগে যত জল।
প্রায় দামোদর তত আনয়ে একল ॥
বহিরাচরণ লাগি দাসীগণ আনে।
কলস লৈয়া যবে যায় গঙ্গাস্নানে ॥

চৈতন্যদেবের বিদায়ে বেদনা বিধুরা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরও প্রায় ভেঙে গিয়েছিল। অসহ্য বিরহ যাতনায় তিনি প্রায় নিদ্রাহীন হয়েছিলেন। তাঁর শরীর তনু হয়েছিল চতুর্দশীর চাঁদের মত ক্ষীণ। ভক্তিরত্নাকরে—

প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা ত্যজিল নেত্রেতে।
কদাচিৎ নিদ্রা হৈল শয়ন-ভূমিতে ॥ ৪৮ ॥

কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীণ ॥ ৪৯ ॥

শচীমাতার মৃত্যু শোক সামাল দিতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে ডুব দিতে হয়েছিল কৃচ্ছ্রসাধনায়। সুদীর্ঘ পরমায়ু নিয়ে তিনি চৈতন্যদেব বিহনে সাময়িকভাবে ত্যাগ করেছিলেন অন্ন-জল। 'বংশীশিক্ষায়'—

বিষ্ণুপ্রিয়া আর বংশী গৌরাঙ্গ বিহনে।
উন্মত্তের ন্যায় কান্দে সদা সর্ব্বক্ষণে ॥
দুই জনে অন্ন-পান করিয়া বর্জ্জন।
হা নাথ গৌরাঙ্গ বলি ডাকে সর্ব্বক্ষণ ॥

এক সময় চোখের জল মুছে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী মহাযোগিনী সাজিয়া রুদ্ধদ্বার-গৃহে বসিয়া কঠোর ভজন করিতে লাগিলেন। কলির জীবের মঙ্গল-কামনায় দেবী জীবন উৎসর্গ করিলেন।' (বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত)। তপস্বিনী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শান্ত সমাহিত চিত্তে পরবর্তী সাধনার স্তরকে চরমতম কৃচ্ছ্রসাধনার পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। চৈতন্যদেবের ক্ষুদ্রশয়ন কক্ষের ভূমিশয্যায় তাঁর এই সাধনাকে 'নদীয়ার মহাগম্ভীরা লীলা' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

এই যে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কঠোরতম কৃচ্ছ্রসাধনা—এই অনুপ্রেরণা আসলে তিনি পেয়েছেন পতিদেবতা চৈতন্যদেবের জীবনাচরণ থেকেই। যদিও চৈতন্যদেব প্রদর্শিত এই পথাবলম্বন করার জন্য তিনি আগ্রহী হয়ে উঠে ছিলেন বহুদিন। অল্পদিনের ব্যবধানে শাশুড়ি এবং স্বামীর ইহজগত থেকে বিদায় বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জীবনে বড় দুটি ধাক্কা ছিল। এবং এই দুটি ধাক্কা ভজন সাধনে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে বহু যোজনের পথ। তাঁর সাধনার সিদ্ধি অনেক কম সময়ে হয়েছিল বলেই তাঁর দীর্ঘায়ু পথ কেটেছে আহার্যের কিঞ্চিৎ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে।

মহাবৈষ্ণবী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী একটি বিষয়ে খুব কঠোর ছিলেন। তাঁর ভজন মন্দিরে সখী কাঞ্চনা, মালিনীদেবী ও সেবক বংশীবদন ছাড়া আর কাউকে তিনি প্রবেশাধিকার দেননি। তাঁর কঠোর ভজনের সংবাদ শুনে অদ্বৈত প্রভু শান্তিপুর থেকে তাঁর সেবক ঈশাণ নাগর কে নবদ্বীপে পাঠিয়েছিলেন। দামোদর পণ্ডিতের মুখে ভজন প্রণালী বৃত্তান্ত অবগত হয়ে আবার শান্তিপুরে গিয়ে তা সে নিবেদন করেছিল অদ্বৈতপ্রভুকে। অতি বৃদ্ধ অদ্বৈতপ্রভু নবীনা যোগিনী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মহাযোগিনীর মত

আচরণ শুনে ভাবাপ্লুত হয়ে 'হা কৃষ্ণ' বলে শিশুর মত অঝোরে কেঁদেছিলেন। ঈশাণ নাগর রচিত 'অদ্বৈত প্রকাশ' গ্রন্থ এ সম্পর্কিত তথ্যে সমৃদ্ধ হয়েছে।

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কঠোরতম ভজন সাধন বৃত্তান্ত ক্রমশঃই ছড়িয়ে পড়তে লাগল দূর থেকে দূরান্তরে। উৎসাহী ভক্তমণ্ডলে আলোচনা হতে থাকল যে, নীলাচলে মহাপ্রভুর গম্ভীরালীলা বড় না নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মহাগম্ভীরার আকর্ষণ বেশি? মহাপ্রভুকে বড় অসময়ে হারিয়ে তারা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর নেতৃত্বে গৌর ভজনা করার জন্য একে একে নবদ্বীপে ফিরে আসতে লাগল। সুসংগঠিত হল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গৌরভক্তবৃন্দ। তারা চৈতন্যদেবের বাড়ির পাঁচিলের গায়ে অথবা পার্শ্ববর্তী বৈষ্ণব ভক্তদের বাড়ীতে এসে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিতে শুরু করল। এরাই দামোদর পণ্ডিতের কাছে দাবী তুলল যে, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর চরণ-দর্শন ও প্রসাদ পেতে ইচ্ছুক তারা। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কাছে দামোদর বিবেচনা ফলপ্রসূ করার আর্জি পেশ করলেন। অবশেষে সম্মতি দিলেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। মহাপ্রভুকে ভোগ নিবেদন করার পর বিকেলে দর্শন সময় নির্ধারিত হল। তবে নিময় করা হল দিনে একবারই মাত্র প্রবেশ করা যাবে পাঁচিলের ভেতরের আঙ্গিনায়। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে দর্শন ও মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদের আশায় বিকেল পর্যন্ত উপবাসী থাকে ভক্তরা। 'অদ্বৈত প্রকাশ' গ্রন্থে—

—'ভক্ত সব আইসে তবে পাইয়া আদেশ।
বাড়ীর বাহিরে চারি দিকে ছানি করি।
ভক্ত সব রহিয়াছে প্রাণ মাত্র ধরি॥
কোন ভক্ত গ্রামে কেহ আছে আস্‌পাশ।
একত্র হঞা অভ্যন্তর যান সব দাস॥
তাবৎ না করে কেহ জল পান মাত্র।
অনন্য শরণ যাতে অতি কৃপাপাত্র॥'—

প্রভুকে ভোগ লাগানো মহাপ্রসাদ দামোদর পণ্ডিত মাধ্যমে ভক্তদের মধ্যে বন্টন হয়। ভক্তগণ, দাস দাসী, সেবকবৃন্দ ওই মহাপ্রসাদ গ্রহণের পর পাত্রের গায়ে যা লেগে থাকে তাতে নামমাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। প্রসাদের পরিমাণ বিন্দুমাত্র বাড়ান না তিনি অথচ ওই সামান্য প্রসাদে ভক্তদের অধিকার হওয়াতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্য আসলে অবশিষ্ট কিছুই থাকে না। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর এ আহার সংযম সহ্য করতে পারে না বংশীবদন। সে আড়ালে শুধু চোখের জল ফেলে। আর ভাবে বুঝাই সে দেবীর মন্ত্রশিষ্য হয়েছে।

'প্রসাদ গ্রহণের পর দেবী দর্শন। তবে তা দামোদরের বিধিনিষেধ মেনে। বারান্দার ভিতে আপাদমস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিত বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী দণ্ডায়মান ভক্তবৃন্দ সুশৃঙ্খলভাবে আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে। একজন দাসী পায়ের দিকের বস্ত্র সামান্য উন্মোচন করে। বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ দেবীর রাতুল চরণ দর্শন করে কৃতার্থ হয়। কেউ কেউ হারিয়ে ফেলে বাহ্যজ্ঞান। 'অনুরাগবল্লীতে' ঃ

পিঁড়াতে কাঁড়ার টানা বস্ত্রের আছয়ে।
তাহার ভিতরে ঠাকুরাণী ঠাড় হ'য়ে ॥
আঙ্গিনাতে সব ভক্ত একত্র হইলে।
দাসী যাই কাঁড়ার রঞ্চেক ধরি তোলে ॥
চরণ-কমল মাত্র দর্শন পাইতে।
কেহ কেহ ঢলিয়া পড়য়ে কোন ভিতে ॥

চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলনকে সুসংগঠিত করতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর যে ভূমিকা ছিল সে সম্পর্কে 'পরমা প্রকৃতি বিষ্ণুপ্রিয়া'য় বলা হয়েছে—"বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সেই দুর্নিবার দুঃখ দাহই নদেবাসী শত্রু-মিত্র সকলকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করে এক সুশীতল ছায়ার আশ্রয়ে সকলকে একত্রিত করেছিল। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এতকাল কৃষ্ণপ্রেমে কেঁদে কেঁদে উন্মাদনার বিহ্বলতায় যে দুরূহ কাজ সাধন করতে পারেন নি, সেই দুরূহ কর্ম সিদ্ধ হলো বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দুঃখ জ্বালার অনল দাহনে। বাহ্য জীবন চূর্ণ করে সর্ব জীবের জন্যে তিনি এক অপরূপ প্রাণ সঞ্জীবনী প্রস্তুত করলেন। তাই প্রভুর নবলীলায় বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকা অভিনব।'

এমনি সময়ে নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হ'ল উনিশ বছরের তরুণ যুবক শ্রীনিবাস। রাঢ়ীয় শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ চৈতন্য দাসের পুত্র সে। ছোটবেলা থেকেই শ্রীনিবাসের মনে বৈরাগ্য উদিত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ দর্শন লাভের আশায় সে নীলাচলে গিয়েছিল। কিন্তু নীলাচলে পৌঁছুবার আগেই সে জানতে পারে চৈতন্যদেব অমৃতলোকে চলে গেছেন। অন্যদিকে চৈতন্যদেব পূর্বেই বুঝেছিলেন শ্রীনিবাস নীলাচলে আসবেই। তাই মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি পণ্ডিত গোস্বামী গদাধরকে আদেশ দিয়ে যান, শ্রীনিবাস নীলাচলে এলে তাকে যেন ভাগবতের কৃষ্ণলীলামৃত পড়ে শোনানো হয়। কিন্তু পণ্ডিত গোস্বামী গদাধর চৈতন্যবিরহে কেঁদে কেঁদে নিজের

ভাগবতটিকে চোখের জলে সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলেছিলেন। শ্রীনিবাসের সব আশাই ব্যর্থ হয়ে যায় দেখে বৃদ্ধ গোস্বামী গদাধর তাকে নবদ্বীপে যেতে নির্দেশ করেন। অতঃপর শ্রীনিবাস—

নবদ্বীপ প্রবেশিতে দেখে চমৎকার।
ভক্তগোষ্ঠী-সহ প্রভুর প্রকট-বিহার ॥ ৮ ॥
পরম অদ্ভুত গৌরাঙ্গের গুণ গাই।
নবদ্বীপাঙ্গনা সব করে ধাওয়া ধাই ॥ ৯ ॥
ভুবন মঙ্গল সঙ্কীর্তন ঘরে ঘরে।
আনন্দের নদী বহে নদীয়া-নগরে ॥ ১০ ॥
দেখি' আত্মবিস্মরিত হৈল শ্রীনিবাস।
কে কহিতে পারে যৈছে বাড়িল উল্লাস ॥ ১১ ॥
ঐছে কতক্ষণ দেখি' দেখে তারপর।
দুঃখের সমুদ্রে সবে ভাসে নিরন্তর ॥ ১২ ॥
শ্রীনিবাস বিস্মিত হইয়া আগে যায়।
প্রভুর আলয় কোথা সবারে শুধায় ॥ ১৩ ॥ [ভক্তিরত্নাকর]

চৈতন্যদেবের বাড়ীর কাছে এসে পাঁচিলের বাইরে বসে চোখের জল ফেলে উপবাসে শ্রীনিবাস রাত জেগে পড়ে থাকল। সকালবেলা বংশীবদন সে পথ দিয়ে যেতে কৌতুহল বশতঃ—

নিকটে আসিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসিল।
শ্রীনিবাস আদ্যোপান্ত সব নিবেদিল ॥ ২১ ॥ [ঐ]

বংশীবদন শ্রীনিবাসকে আশ্বস্ত করে এবং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দর্শনলাভ ঘটাবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ সমাপন করতে গেল। ওদিকে ঘুম থেকে উঠে দাসীকে ডেকে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী অদ্ভুত স্বপ্নের কথা শোনালেন—

এথা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রিয়দাসী প্রতি কয়।
দেখিনু স্বপন, কহি মনে যে আছয় ॥ ২৫ ॥
ভুবন মোহন প্রভু মোর প্রাণপতি।
আইলা আমার আগে, কি মধুর গতি। ২৬ ॥
... ...
কত না আদরে মোরে বসায়ে আসনে।
ধীরে ধীরে কহে মোরে মধুর বচনে ॥ ৩৪ ॥
শ্রীনিবাস—নামে এক ব্রাহ্মণ কুমার।

পাইল যতেক দুঃখ—লেখা নাহি তা'র ॥ ৩৫
অদ্য আসিবেন তিঁহ তোমার দর্শনে।
আপনা জানিয়া কৃপা করিবা তাহানে ॥ ৩৬ ॥
ঐছে কত কহি কি আনন্দ প্রকাশিয়া।
হৈল অদর্শন, দুঃখে বসিনু জাগিয়া ॥ ৩৭ ॥
বুঝিনু সে মোর প্রাণনাথ-প্রিয় অতি।
মনে হেন হয়—তার হ'বে শীঘ্র গতি ॥ ৩৮ ॥ [ঐ]

বংশীবদন কাজ সেরে দ্রুত ঘরে এসে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে জানাল শ্রীনিবাস বৃত্তান্ত। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বুঝলেন চৈতন্যদেবের মহিমা। শ্রীনিবাস সে সামান্য কোন বৈষ্ণব ভক্ত নয়, একথা তিনি অনুমান করে নিলেন। তাকে দিয়ে ভবিষ্যতে বৈষ্ণব জগতের অনেক অসাধ্য কর্ম সাধিত হবে। অতএব শ্রীনিবাসের সুপ্ত শক্তি জাগ্রত করতে হবে এই চৈতন্যদেবের ইচ্ছা, তাই ভোর রাতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে প্রভুর ওই স্বপ্নে দর্শন দেওয়া। স্বামী তাঁকে দিয়ে এভাবে মহানকার্য করাতে চান ভেবে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দুচোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু নেমে এল। ভক্তিরত্নাকরে—

হেনকালে শ্রীবংশীবদন জানাইলা।
নীলাচল হৈতে শ্রীনিবাস এথা আইলা ॥ ৩৯ ॥
শুনি ঈশ্বরীর ইচ্ছা হইল দেখিতে।
শ্রীনিবাস গেলেন শ্রীঈশ্বরী সাক্ষাতে ॥ ৪০ ॥
প্রেমধারা নেত্রেতে বহয়ে নিরন্তর।
ধরণী—লোটাঞা কৈল প্রণতি বিস্তর ॥ ৪১ ॥
শ্রীনিবাস প্রণময়ে শুনিয়া ঈশ্বরী।
দাঁড়াইল সঙ্গোপনে গৌরাঙ্গ স্মঙরি ॥ ৪২ ॥
প্রভুর বিচ্ছেদ-দাবানলে জ্বলে হিয়া।
তথাপি উল্লাস শ্রীনিবাসে নিরখিয়া ॥ ৪৩ ॥
বাৎসল্যানুগ্রহে 'কহি' মধুর বচন।
শ্রীনিবাস-মস্তকে দিলেন শ্রীচরণ ॥ ৪৪ ॥
মহাপ্রসাদ ভুঞ্জাইতে আজ্ঞা দিয়া।
হইলেন স্তব্ধ, নেত্রজলে ভাসে হিয়া ॥ ৪৫ ॥
শ্রীনিবাসে দিল কেহ প্রসাদ বিরলে।
পাইল প্রসাদ, সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে ॥ ৪৬ ॥

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পর তপশ্চারিণী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এই প্রথম স্বামীকে স্মরণে এনে মাথার ঘোমটার সামান্য আড়াল সরিয়ে কোন পর পুরুষের মুখ দর্শন করলেন। এ ছাড়াও শ্রীনিবাসের বৈরাগী হবার মনোবাসনা তিনি ত্যাগ করার নির্দেশ দান করেন। অবশ্য শ্রীনিবাস আত্মপক্ষ সমর্থনে যখন, অল্পবয়সে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের উদাহরণ তুলে ধরল তখন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাকে আর নিরস্ত করতে না পেরে তিনি আরও দুঃসাহসী কার্য করে বসলেন। শ্রীনিবাসকে তিনি তাঁর তপস্যালব্ধ স্পর্শ দিয়ে শক্তি সঞ্চারিত করলেন। উপস্থিত বৈষ্ণব-ভক্তবৃন্দ বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে গেলেন এই ভেবে যে, জগতে শ্রীনিবাস এত বড় সৌভাগ্যবান যে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তার মাথায় পাদস্পর্শ দেবার মত অসম্ভব কার্যটি করলেন। অতএব শ্রীনিবাসের প্রতি দেবীর অপার কৃপা দেখে সবাই তাকে বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর 'বরপুত্র' বলে মান্য করতে শুরু করল।

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পাদ স্পর্শে শ্রীনিবাসের মধ্যে প্রেমাবেশ ঘটেছিল। প্রেমানন্দে কাঁদতে কাঁদতে সে দেবীর চরণতলে লুটিয়ে পড়লে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাকে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারার্থে বেশ কিছু তীর্থস্থানে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশ—

—শুন শুন ওহে বাপু তুমি ভাগ্যবান।
তোমাতে চৈতন্য-শক্তি ইথে নাহি আন ॥
তবে শান্তিপুর যাই খড়দহে যাবে।
আচার্য্য গোসাঞি দেখি পরিচয় পাবে ॥
খড়দহ যাইয়া দেখিবে নিত্যানন্দ।
তোমা পাইয়া জাহ্নবার হইবে আনন্দ ॥
বিলম্ব না কর বড় যাও শীঘ্র করি।
অনেক দেখিবে শুনিবে রূপের মাধুরী ॥
সর্ব্বত্র মিলন করি যাও বৃন্দাবন।
সর্ব্বসিদ্ধি হবে পথে করিবে স্মরণ ॥ [প্রেমবিলাস]

উল্লেখ্য, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর নির্দেশ মতই শ্রীনিবাসাচার্য পরে সংসারী হয়েছিল। এবং বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার ও প্রসারে বৃহত্তর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তার ভেতরের সুপ্ত স্রোতস্বিনী কুল কুল ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর শক্তি প্রদানের ফলেই।

তেজস্বিনী নারী হিসেবে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আরেকটি পরিচয় এখানে তুলে

ধরা প্রয়োজন বলে মনে করেছি। শ্রীনিবাসকে পণ্ডিত গোস্বামী গদাধর নবদ্বীপে প্রেরণ করার সময় নবদ্বীপের দাস গদাধরকে জ্ঞাত করার জন্য কিছু বক্তব্য প্রহেলি আকারে বলেছিলেন। ভগ্ন হৃদয় শ্রীনিবাস নবদ্বীপে ফিরে এসে সমস্ত একেবারেই ভুলে যায়। পরে যখন তার প্রহেলিটি মনে পড়েছিল তখন দাস গদাধরকে তা বললে দাস গদাধর তার ওপর ক্রুদ্ধ হন ও শ্রীনিবাসকে ত্যাগ করেন। আসলে গোস্বামী গদাধরের মৃত্যু সংবাদ নীলাচল থেকে নবদ্বীপে ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছিল। দাস গদাধরের অন্যান্য অনুগামী বৈষ্ণবগণও শ্রীনিবাসকে ত্যাগ করেছিলেন এই ঘটনায়। শ্রীনিবাসের শিষ্য মনোহর দাসের 'অনুরাগবল্লী' থেকে জানা যায় বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর ইচ্ছায় ও উপস্থিতিতে দাস গদাধর দেবীর আদেশ মেনে নিয়ে শ্রীনিবাসের সব অপরাধ মার্জনা করেছিলেন, অবশেষে প্রেমালিঙ্গন দান করেছিলেন। স্বভাবতই দাস গদাধরের অনুগামী নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণও শ্রীনিবাসকে আন্তরিকভাবে কাছে টেনে নেন।

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আকুল আহ্বানে চৈতন্যদেব তাঁকে মাঝে মধ্যেই স্বপ্নে দর্শন দেন। নির্দেশ করেন পরবর্তী কর্মপন্থার ও পদ্ধতির। ঘরে বিষ্ণু-মূর্তির নীচে কাষ্ঠ পাদুকা রেখে, বহুক্ষণ বুকে জড়িয়ে ধরে আকুল কান্নায় ভিজিয়ে দিয়েও যেন আশা মেটেনা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর। কোথায় যেন একটা অপ্রাপ্তি রয়ে যাচ্ছে। তিনি তো চৈতন্যদেবকে এখন সশরীরে সর্বদাই নবদ্বীপে বিরাজিত দেখতে চান। কিন্তু চৈতন্যদেব তো অমৃত লোকে গমন করেছেন। কিভাবে এটা সম্ভব হবে তা গভীরভাবে বিচলিত করে তোলে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে। তিনি ভাবেন চৈতন্যদেবের বাণীও যে অমোঘ সত্য। তিনি তো বলেছিলেন—

শুন দেবি বিষ্ণুপ্রিয়া, তোমারে কহিল ইহা,
যখনে যে তুমি মনে কর।
আমি যথা তথা যাই, আছিয়ে তোমার ঠাঁই
এই সত্য কহিলাম দঢ় ॥ [চৈতন্যমঙ্গল—লোচন দাস]

এসব চিন্তা মাথায় নিয়েই ভেতর বাড়িতে শয়নে যান বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। যদিও এই গৃহই তাঁর-ভজন-পূজন-সাধন-আরাধনা তথা বিশ্রাম স্থল।

বাইরের বাড়িতে শুয়ে আছে সেবক বংশীবদন। সেও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিরহখিন্ন অবস্থার কথা চিন্তা করতে করতে 'হা গৌরাঙ্গ' বলে একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘুমে অচেতন হয়। রাত শেষ হয়ে আসছে এমন সময় ভেতর বাড়ি ও বহির্বাড়িতে আলাদা আলাদা দুই ঘরেই মহাপ্রভু স্বপ্নে আবির্ভূত হলেন। তাঁকে যে স্মরণ করেছেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। চৈতন্যদেবকে তো পণ রক্ষা করতে হবে।

একই সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও বংশীবদন শুনতে পাচ্ছেন চৈতন্যদেবের স্বপ্নাদেশ। তিনি বলছেন, তোমাদের ইচ্ছাই বলবতী হবে। আমি যে নিমতলায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম সেই নিম গাছটি কাটাবার ব্যবস্থা কর। ঐ নিম কাঠ দিয়েই আমার মূর্তি ভাস্কর ডেকে নির্মিত করে নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠা কর। এবং নিত্য সেবা পূজা কর। আমি ঐ মূর্তিতেই অধিষ্ঠিত থাকবো। এ কথা বলেই চৈতন্যদেব দিব্য আলো ছড়িয়ে দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। তাঁর আলোকচ্ছটায় ও চৈতন্যদেবের কণ্ঠস্বরে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ঘুম ভেঙে যায়। ওদিকে বংশীবদনেরও একই অবস্থা। দু'জনেই স্পষ্ট শুনতে পেয়েছেন :

—আমার আদেশ এই করহ শ্রবণ।
যে নিম্বতলায় মাতা দিলা মোরে স্তন ॥
সেই নিম্ববৃক্ষে মোর মূর্ত্তি নির্মাইয়া।
সেবন করহ তাতে আনন্দিত হৈয়া ॥
সেই দারু মূর্ত্তি মধ্যে মোর হবে স্থিতি।
এ লাগি সেবাতে তার পাইবে পিরিতি ॥— [বংশীশিক্ষা]

স্বপ্ন শেষে 'প্রভু প্রভু' বলে আকুল চীৎকার উঠল ভেতর ও বাইরের ঘরে। ঘোর যেন কাটতেই চায় না উভয়েরই।

প্রভুর একথা স্বপ্নে শ্রবণ করিয়া।
দুই ঘরে দুই জনে উঠিল কান্দিয়া ॥ [ঐ]

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন বোধ করছি—চৈতন্যদেবের মূর্তি 'নবদ্বীপে' প্রতিষ্ঠা করার জন্য আদেশ হল এই প্রথম। কিন্তু এটিই গৌরাঙ্গদেবের প্রথম মূর্তি স্থাপনের দৃষ্টান্ত নয়। এর আগে গৌরাঙ্গদেবের জীবিতাবস্থায় বর্ধমানের 'অম্বিকা কালনা'য় ভক্ত গৌরীদাস পণ্ডিতের বাড়িতে গৌর-নিতাই-এর 'যুগল মূর্তি' প্রতিষ্ঠা হয়েছে। অবশ্য গৌরাঙ্গদেবের 'একক মূর্তি' নবদ্বীপেই প্রথম প্রতিষ্ঠার আদেশ হয়।

গৌড়মণ্ডলে পরিভ্রমণ করা কালীন গৌরীদাস পণ্ডিতের বাড়িতে যখন

গৌর-নিতাই কীর্তনানন্দে মত্ত ছিলেন তখন—

কান্দি গৌরীদাস বলে পড়ি প্রভুর পদতলে
কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী ॥
আমার বচন রাখ অম্বিকা-নগরে থাক
এই নিবেদন তুয়া পায়।
যদি ছাড়ি যাবে তুমি নিশ্চয় মরিব আমি
রহিব সে নিরখিয়া কায় ॥
... ...
প্রভু কহে গৌরীদাস ছাড়হ এমত আশ
প্রতিমূর্ত্তি সেবা করি দেখ।
তাহাতে আছিয়ে আমি নিশ্চয় জানিহ তুমি
সত্য মোর এই বাক্য রাখ ॥ [দুঃখী দীন কৃষ্ণদাস]

গৌরীদাস গৌর-নিতাইয়ের দুটি আলাদা কাঠের প্রতিমূর্ত্তি তৈরি করিয়ে আনলে গৌর-নিতাই তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। গৌরীদাস অবাক বিস্ময়ে দেখে সবই মানবীয় শরীর। কোনটিকেই সে কাষ্ঠ নির্মিত বা আলাদা বলে চিহ্নিত করতে পারল না।

আকুল দেখিয়া তারে কহে গৌর ধীরে ধীরে
আমরা থাকিলাম তোর ঠাঞি।
নিশ্চয় জানিহ তুমি তোমার এ ঘরে আমি
রহিলাম এই দুই ভাই ॥
এতেক প্রবোধ দিয়া দুই প্রতিমূর্ত্তি লৈয়া
আইল পণ্ডিত বিদ্যমান।
চারিজনে দাঁড়াইল পণ্ডিত বিস্ময় ভেল
ভাবে অশ্রু বহয়ে নয়ান ॥ [ঐ]

ওদিকে পাখির ডাকে ভোর ঘোষণা হয়। বংশীবদন করযোড়ে বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে নিবেদন করে স্বপ্ন বৃত্তান্ত। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও একই স্বপ্নের কথা বলেন বংশীবদনকে। অতঃপর দুজনে মিলে আলোচনা করে নিলেন গৌরীদাসের ঘরে তো গৌরনিতাই প্রভুদ্বয় নিত্য বিরাজমান বহুদিন থেকেই। এতদিনে নবদ্বীপেরও গৌরব বৃদ্ধি পেল। ঘরের ছেলে এখন থেকে ঘরেই থাকবেন। সকালবেলাতেই বংশীবদন স্বপ্নাদেশ সার্থক করতে কর্মকার ডেকে নিমগাছটি কাটাল। এবং সুদক্ষ ও প্রসিদ্ধ ভাস্কর নবীনানন্দ আচার্যকে ডেকে গৌরাঙ্গের দারুমূর্তি নির্মাণ করতে আদেশ করল। বংশীশিক্ষায়—

—রজনী প্রভাত হইলে ডাকিয়া কামার
সেই নিম্ব বৃক্ষ কাটে চট্টের কুমার ॥
তবে ডাক দিয়া বংশী কহেন ভাস্করে।
গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি এই কাষ্ঠে দাও করে ॥
ভাস্কর কান্দিয়া কহে মোর শক্তি নাই।
বংশী কন দিবে শক্তি ঠাকুর নিমাই ॥

নির্দেশ মত মূর্তি তৈরি করতে ভাস্করের সময় লেগেছিল পনেরদিন। তৈরি মূর্তির পাদদেশে বংশীবদন লৌহ অস্ত্রে খোদিত করে দিয়েছিল নিজের নাম। যে খোদাই নবদ্বীপ মহাপ্রভু বাড়ীর মূর্তিতে আজও স্পষ্ট পড়া যায়। মূর্ত্তি দেখে বংশীবদন ভাবল এই ত প্রাণনাথের দর্শন পেলাম। এতদিন বৃথাই তাঁর বিহনে জ্বালা সয়েছি। 'বংশীশিক্ষায়'—

—তবেত ভাস্কর করি প্রভুরে প্রণাম।
নির্জ্জনে বসিয়া করে শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ॥
এক পক্ষ মধ্যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া।
ঠাকুরে সংবাদ দিল ভাস্কর যাইয়া ॥
ঠাকুর আসিয়া শ্রীমূর্ত্তির পদ্মাসনে।
লৌহ অস্ত্রে নিজ নাম করিল লিখনে ॥
তবে বস্ত্র-সেবা আদি সারিয়া ভাস্কর।
প্রভুরে দেখায় ডাকি গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥
গৌরাঙ্গ দেখিয়া বংশী ভাবে মনে মনে।
সেই ত পরাণনাথ পানু দরশনে ॥

প্রাণভরে মূর্তি দর্শন করে বংশীবদন ঈশাণকে ডেকে বলল, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সংবাদ দাও যে শ্রীমূর্ত্তি আঙিনায় এসেছেন। 'বিষ্ণুপ্রিয়া নাটকে'—

ঈশাণ। যাও অন্তঃপুরে তুমি,
এসেছেন শ্রীমূর্ত্তি আঙ্গিনায়,
দাও গিয়ে এ সংবাদ,
নবদ্বীপময়ী জগজ্জননী মায়ে।

ধীর পায়ে আঙ্গিনায় নেমে আসেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। আস্তে আস্তে এগোন নবনটবর মোহন মূর্তির কাছে। 'বংশীশিক্ষায়'—

—তবে বিষ্ণুপ্রিয়া যাঞা গৌরাঙ্গ সুন্দরে।

দরশন করি দেবী ভাবেন অন্তরে ॥
সেই ত পরাণনাথে দেখিতে পাইনু
যাঁর লাগি মনাগুণে দহিয়া মরিনু ॥

এবার মূর্তি প্রতিষ্ঠার পালা। পাঁজি-পুঁথি দেখে একটি শুভদিন স্থির করা হল। তৈরি করা হল নিমন্ত্রণ পত্রিকা। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সুনিপুণ তত্ত্বাবধানে বংশীবদন সমস্ত বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পত্রিকা মারফত আমন্ত্রণ জানাল। দীন-দুঃখীকে দান-ধ্যান, বৈষ্ণব সেবা, কীর্তন প্রভৃতির আয়োজন মহাযজ্ঞের রূপ নিল। নির্ধারিত দিনে বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলীর উপস্থিতিতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্বয়ং গৃহাভ্যন্তর থেকে নীরব নেতৃত্ব দিয়ে নবদ্বীপধামে শচী আঙ্গিনায় মূর্তি প্রতিষ্ঠা করালেন, অন্যতম বর্ষীয়ান সেবক বংশীবদনকে দিয়ে। বংশীশিক্ষায়—

দিন স্থির করি তবে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার।
সর্ব্ব ঠাঁই পত্র দিলা চট্টের কুমার ॥
নিরূপিত দিনে সবে কৈলা আগমন।
শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা তবে করেন বদন ॥
মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কৈল আয়োজন যত।
শ্রীঅনন্তদেব নারে বর্ণিবারে তত ॥
প্রচ্ছন্ন ভাবেতে আসি যত দেবগণ।
প্রতিষ্ঠার কালে গোরা করেন দর্শন ॥
প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রভু শ্রীবংশীবদন।
সকলে করেন মহাপ্রসাদ ভোজন ॥

এতদিন নবদ্বীপে ছিল একটিমাত্র জিনিস। তা হল 'গৌরমন্ত্র'। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী চৈতন্যদেবকে দুটি রূপেই ভক্তবৃন্দের কাছে উদ্ঘাটিত করলেন —মন্ত্ররূপে, মূর্ত্তিরূপে।

মূর্তি প্রতিষ্ঠার কাজ সমাপ্ত হলে তার নিত্যকার পূজা ও ভোগের জন্য বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁর ভ্রাতা যাদব আচার্যকে নিয়োগ করলেন। বিবাহের সময় বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পিতা সনাতন মিশ্রের অনুরোধে তাঁর একমাত্র পুত্র যাদব মিশ্রের ভারও নিয়েছিলেন গৌরাঙ্গদেব। পরবর্তী সময়ে তিনি পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও শ্যালক যাদব মিশ্রকে দীক্ষা দান করেন। দীক্ষান্তর যাদব মিশ্র হল 'যাদব আচার্য'। মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী আত্মজ যাদবের হাতেই গৌরাঙ্গ মূর্তির সেবা-পূজা রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, পাঁচশো বছর আগত প্রায়। আজও যাদব আচার্যের বংশধরগণ মারফত 'শ্রীশ্রীধামেশ্বর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর' সেবা-পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বর্তমানে নবদ্বীপের মহাপ্রভু পাড়ায় এই ধামেশ্বর প্রভুর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তনই এর জন্য মূলত দায়ী। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁর অন্তিমকালে যাদব-তনয় মাধব আচার্যকে 'দত্তক পুত্র' হিসেবে গ্রহণ করে তাকে দীক্ষা দান করেন এবং গৌরাঙ্গ প্রভুর সেবাভার তার হাতে অর্পণ করেন। এই জন্য এই বংশ 'বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবার' আখ্যা পেয়েছে। এই পরিবারের সন্তানেরাই শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজার একমাত্র অধিকারী। এবং গোস্বামী মায়েদের ও বধূদের হাতে প্রভুর ভোগ রন্ধনাদি কার্য অর্পিত আছে। মহাপ্রভু তাঁর শ্বশুরের কাছে প্রতিশ্রুতি মতো এভাবেই যাদবাচার্যের বংশধরদের দেখে যাচ্ছেন বলে 'বিষ্ণুপ্রিয়া-পরিবারের' সন্তানগণের বিশ্বাস।

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও বংশীবদন প্রতিষ্ঠিত উক্ত দারুমূর্তি আজও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মণ্ডলীর দ্বারা পূজিত হচ্ছে।

মূর্তির প্রতিদিন সেবাভার যাদব আচার্যের ওপর থাকলেও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সেবক বংশীবদন প্রতিদিন প্রভুর চরণে তুলসী-ফুল গঙ্গাজল দিয়ে পূজো করে তবে জল স্পর্শ করত। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা-পরিচর্যা তো প্রভু প্রদত্ত আজ্ঞা। মূর্তি প্রতিষ্ঠা পাবার পর বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সাধারণ মানবিকতা হেতু প্রবীণ অসমর্থ সেবকদের একটি বিষয় থেকে রেহাই দিয়েছিলেন, তা হল তাঁর জন্য গঙ্গা থেকে বহু ঘড়াজল আনা। দামোদর পণ্ডিত অবশ্য এই ব্যবস্থায় মনে মনে একটু ক্ষুন্নই হয়েছিলেন। কারণ তিনি ভাবলেন তার ওপর থেকে অকারণে একটি গুরুদায়িত্ব তুলে নিলেন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। অন্যদিকে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ভেবেছিলেন বৃদ্ধ অভিভাবক দামোদরের কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। সখী কাঞ্চনা সহ অন্তরঙ্গ দু'একজন সেবকের কড়া পাহারায় বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এখন থেকে গঙ্গায় যান কাক ভোরে। গঙ্গাস্নান করে এসে প্রবেশ করেন মন্দিরে। নয়ন ভরে দর্শন করেন রসময় প্রভু-মূর্তি। কিছুক্ষণ ধ্যান-যোগাসনে থেকে মনের মত করে সাজান স্বামীকে। বাইরে থেকে সেবা মন্দিরের দ্বার বন্ধই থাকে। এভাবে পূজার্চ্চনার মধ্য দিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী

মিলিত হন প্রভুর সঙ্গে। যাদব করেন শাস্ত্রোক্ত অষ্টকালীন সেবা। যথা—

নিশান্ত প্রাতঃ পূর্বাহ্নো মধ্যাহ্নমপরাহ্নকঃ।
সায়ং প্রদোষো রাত্রিশ্চ কালা অষ্টৌ যথাক্রমম্ ॥

এক. মহাপ্রভুর সিংহাসন উন্মোচনান্তে নিশান্ত কীর্তন 'উঠ উঠ গোরাচাঁদ নিশি পোহাইল।'

দুই. প্রাতে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর কীর্তনসহ মঙ্গলারতি। গৌরলীলা গীতি, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পারায়ণ।

তিন. পূর্বাহ্নে পূজা, অর্চনা, মাল্যদান, ৮ দন্ড বেশবিন্যাস, ফল মিষ্টাদি মালসা ভোগ আরতি বন্দনা।

চার. মধ্যাহ্নে পঞ্চবিধ ব্যঞ্জণ, পুষ্পান্ন, কিশোরান্ন ও পরমান্ন সহকারে মহাসমারোহে ভোগ, আরতি। প্রভুর বিশ্রাম সময়-১২ দণ্ড।

পাঁচ. অপরাহ্নে প্রভুর অঙ্গাদি মার্জন, পুষ্প মাল্যাদির দ্বারা সিঙ্গার, আমীক্ষা মিষ্টাদি ভোগ— উত্থান আরতি। সময়—২৪ দণ্ড।

ছয়. সন্ধ্যায় শ্রীভাগবত পাঠ, গৌর কথা।

সাত. প্রদোষে লীলা-কীর্তন ও নাম-সংকীর্তন।

আট. রাত্রে কীর্তন সহযোগে আরতি, তুলসী বন্দনা, দশাবতার স্তোত্র, নামমালা ও গুরু-বন্দনা।

সকাল সন্ধ্যা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও নিজ ভজনকক্ষে চৈতন্যদেবের প্রদত্ত পাদুকায় মঙ্গলারতি করেন। প্রভুর কাছে চোখের জলে আবেদন জানান, কলির জীবের মঙ্গলের জন্য তিনি তাঁর প্রিয়াকে আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করতে যেন শক্তি যুগিয়ে যান। পূর্বেই বলেছি, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের খ্যাতি সর্বত্র সুপ্রচারিত ছিল। চৈতন্যদেবের অনুরাগীবৃন্দ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মধ্যে চৈতন্যদেবেরই সুস্পষ্ট প্রভাব দেখতে পেয়েছিলেন। এভাবেই চৈতন্যদেবের নামের পাশাপাশি অন্যতমা শক্তি হিসেবে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ক্রমশঃই প্রভাবশালিনী হয়ে উঠছিলেন। ওদিকে খড়দহে মর্তলীলা সংবরণ করেছেন নিত্যানন্দ। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন জাহ্নবাদেবী। অদ্বৈত পত্নী সীতাদেবী অনেক আগেই আচার্যার সম্মান পেয়ে গেছেন। এই তিন মহিলা আচার্যা ছিলেন তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবাকাশে এককেটি 'উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।'

নবদ্বীপে 'মহাপ্রভু' মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর চৈতন্যদেব একদিন বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে 'বৈষ্ণব জননীর' ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে স্বপ্নাদেশ করেছিলেন। এবং আরব্ধ কর্ম সম্পাদন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

—শুন সতি বিষ্ণুপ্রিয়া বৈষ্ণব জননী।
নবদ্বীপ রক্ষা কর চিন্ত মনে গুণি ॥
কলি-কালসর্পে দংশিবে সর্ব্বজীবে।
সংকীর্তন বিনা কিছু না করল সবে ॥
তুমি না থাকিলে হব সংকীর্তন বাদ।
নবদ্বীপ লৈয়া হবে বড়ই প্রমাদ ॥
মহান্ত বৈষ্ণব উদাসীনে হবে দ্বন্দ্ব।
তুমি সভার মা, পুত্রে করাবে আনন্দ ॥
বাপশূন্য পুত্র জীয়ে মায় শূন্য মরে।
ইহা জানি থাক সতি নবদ্বীপপুরে ॥

[চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ, বৈরাগ্যখণ্ড]

কিছুদিন পর বৃদ্ধ বৈষ্ণব বংশীবদনের দেহান্তর হল। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী অনুগত প্রিয় শিষ্যের দেহান্তরে দারুণ মর্মাহত হলেন। তিনি ভাবলেন একে একে সবাই ছেড়ে যাচ্ছেন তাঁকে। তবে বংশীবদন একটি অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়েছিল। জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ চৈতন্যঘরণীর আকুল কান্নায় মহাত্মা বংশীবদনের স্বপ্নাদেশ হল, পুত্রবধূর গর্ভেই জ্যেষ্ঠপুত্র চৈতন্যদাসের পুত্র হিসেবে সে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করবে। এই সম্পর্কে 'বংশীশিক্ষা' গ্রন্থে লেখা হয়েছে—

—সেই কালে গোসাঞির পুত্রবধূগণ।
প্রভুর চরণে পড়ি করেন রোদন ॥
জ্যেষ্ঠপুত্র চৈতন্যের পত্নী সাধ্বী সতী।
কান্দিতে লাগিলা বহু করিয়া মিনতি ॥
গোসাঞি কহেন মাগো কেন কান্দ তুমি।
তোমার গর্ভেতে জন্ম লভিব সে আমি ॥
তুয়া প্রেমে বশ হঞা কৈনু অঙ্গীকার।
মোর এই কথা কাঁহা না কর প্রচার ॥—

জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূর গর্ভে যথাসময়ে আবির্ভাব হল বংশীবদনের। বংশী-বদনের পুনরাবির্ভাবের সংবাদ সর্বত্র রটনা হয়ে গেল। বংশীবদন সকলেরই

প্রিয় হবার ফলে তার আবির্ভাব আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করেছিল। বংশীবদনের নব আবির্ভাবে তাকে দেখতে সুদূর খড়দহ থেকে এসেছিলেন জাহ্নবাদেবী। শান্তিপুর থেকে এসেছিলেন সীতাদেবী, প্রমুখ। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁর প্রিয় সেবক ও শিষ্য বংশীবদনের পুনরাবির্ভাবের সংবাদে চৈতন্যনন্দনকে দেখতে তার কুটীরে গিয়েছিলেন। 'বংশীশিক্ষায়'—

—সেইকালে বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যের ঘরে।
আগমন করিলেন আনন্দ-অন্তরে॥
বসিতে আসন দিয়া কহেন চৈতন্য।
তুয়া আগমনে মোর গৃহ হৈল ধন্য॥

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস ও বিয়োগের পর এই প্রথম বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী নিজগৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে পদার্পণ করলেন। অবশ্য বংশীবদনের বাড়ি ছিল চৈতন্যদেবের বাড়ি থেকে সামান্য দূরেই। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই সময় সীতাদেবী, জাহ্নবাদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বৈষ্ণব ভক্ত পরিমণ্ডলের তিন উজ্জ্বল নক্ষত্র এক জায়গায় সম্মিলিত হলেন। এই তিন মহীয়সী নারীর মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ছিল না বললেই চলে। অবশ্য সীতাদেবী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বিবাহের সময় একবার দেখেছিলেন। কিন্তু জাহ্নবাদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কেউ কাউকে আগে কখনও চোখে দেখেননি। এই বংশী-বদনের বাড়িতেই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও জাহ্নবাদেবীর প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাৎ এবং মিলন। এটি নিশ্চয়ই একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কঠোর ভজনের কথা জাহ্নবাদেবী স্বামী নিত্যানন্দ ও বৈষ্ণবভক্তদের মুখে বহুবার শুনেছিলেন। স্বামীর জীবিতাবস্থাতেই জাহ্নবাদেবী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ও তাঁকে কিছু পরামর্শ দিতে অতিরিক্ত ব্যস্ত ও আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। নবদ্বীপে জাহ্নবাদেবীর আগমনে একই সঙ্গে দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হল। প্রথমতঃ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, দ্বিতীয়তঃ চৈতন্যদাসের নবজাতক পুত্রের নামকরণ ও দীক্ষাদান পর্ব। নবজন্মে বংশীবদনের নামকরণ হল রামচন্দ্র। শিশু রামচন্দ্রের কানে বীজমন্ত্র দান করলেন জাহ্নবাদেবী। এই রামচন্দ্রই 'বাঘনাপাড়ায়' বৈষ্ণব তীর্থ ক্ষেত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন পরবর্তীকালে। আজও ওখানে উৎসব-অনুষ্ঠান অব্যাহত।

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সঙ্গে সাক্ষাতে জাহ্নবাদেবী ভাবাবেগে কেঁদে আকুল হলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ক্লিষ্ট শরীরের দিকে তাকিয়ে তাঁকে বোঝাবার ভঙ্গীতে

কাতর কণ্ঠে অনুনয় করে বললেন 'ভগিনি! অতিরিক্ত কঠোরতা করিয়া শরীরপাত করিও না। শরীর নাশ হইলে ভজন-সাধন কি করিয়া হইবে? তোমার প্রাণবল্লভের আদেশে আমার অবধূত স্বামী সংসারী হইয়াছিলেন। আমাকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, কঠোর ভজন শ্রীগৌরাঙ্গের অভিপ্রেত নহে।'
[বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত]।

জাহ্নবাদেবীর বক্তব্যের উত্তরে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী গৌরাঙ্গ ভজন শিক্ষার অনুকরণেই নিজের আচরণের মাধ্যমে সকলকে শিক্ষা দেবার দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করেন। জাহ্নবাদেবী অবশ্য এর কোন উত্তর দিতে পারলেন না। তবে দুই রমণী জ্যোতিষ্কই আলোচনান্তে তাঁদের পতিদেবতার আরব্ধ কর্ম সমাপন করতে স্থির সঙ্কল্প চিত্ত হলেন।

সীতাদেবী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে আদর করে কপালে স্নেহ চুম্বন এঁকে দিলেন। নিজের আঁচল দিয়ে অশ্রুরুদ্ধ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর চোখ মোছালেন এবং বললেন—'মা! তোমাকে দেখিলে আমরা শ্রীগৌরাঙ্গের শোক ভুলিয়া যাই!···তোমার আদর্শ চরিত্র শ্রবণ ও পঠন করিয়া কলি—ক্লিষ্ট জীব সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত হইবে। তোমার কঠোর ব্রহ্মচর্য-ব্রত নারীজীবনের আদর্শ-ধর্ম্ম। তুমি সাধ্বী, তোমার নয়নজলে মহাপাপীরও সর্ব্বপাপ বিধৌত হইবে। তোমার নামের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গনাম চিরমিলিত হইয়া সমগ্র দেশে পূজ্য হইবে। শ্রীগৌর—বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ গৌড়-দেশের প্রতি গৃহে গৃহে পূজিত হইবে।' [বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত]।

প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কঠোর ভজনে শরীরপাত হতে দেখে যখন সমস্ত বৈষ্ণব সমাজ দেবীকে নিবৃত্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত. তখন একমাত্র সীতাদেবীই তাঁকে দ্বিগুণভাবে উৎসাহিত করেন। এতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মনে ভজন—সাধনে আরও বেশি শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল। বলা যেতে পারে, সীতাদেবী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে উপদেশ দিয়ে তাঁর মধ্যে আলাদা শক্তির সঞ্চার করেছিলেন।

অতঃপর বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কর্তৃক মহাপ্রভুকে নিবেদিত মহাপ্রসাদ পাবার জন্য নবদ্বীপে বৈষ্ণব ভক্তের সংখ্যা অগনন হতে থাকল। যে সব ভক্তগণ প্রতিদিন প্রসাদ পাবার জন্য বাইরের বাড়িতে অপেক্ষা করে থাকত তাদের জন্য প্রসাদ বণ্টনের ব্যবস্থা ঠিকই ছিল। বৈষ্ণবী কাঞ্চনা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর স্বহস্তে রন্ধন করা এবং প্রভুকে নিবেদিত ভোগের প্রসাদ কিঞ্চিৎভাবে বৈষ্ণব ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করত।

তবে সেই প্রসাদান্ন বাহির করয়ে।
সেবিকা ব্রাহ্মণী দেই এক এক করি ॥
যে কেহ আইসে তার হয়ে বরাবরি।
প্রসাদ পাইয়া পুন যথাস্থানে যাইয়া।
রহে যথা কথঞ্চিত আহার করিয়া ॥ [অনুরাগবল্লী]

একদিকে গৌরাঙ্গ অদর্শন জনিত বিরহ যন্ত্রণা,অন্যদিকে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার তীব্র বৈরাগ্য সাধনা—এই দুইয়ের যাতনায় অতিবৃদ্ধ, ভগ্নস্বাস্থ্য দামোদর জর্জ্জরিত হয়ে উঠলেন। কঠিন মনোবেদনায় তিনি ইহধাম ত্যাগ করলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর হৃদয় গ্রন্থির একটি তার ছিঁড়ে গেল। তিনি ভাবলেন একে একে ঈশাণ, বংশীবদন, দামোদর সব প্রাচীন পুরুষ পরিকরবৃন্দ তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন। এ সময় বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সেবকদের জন্য মাঝে মাঝে খুব অসহায় বোধ করতেন। তবুও পূর্বের মতই সন্ন্যাসিনী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সাধনা অব্যাহত ছিল। অবশ্য এ সময় থেকে একটি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করলেন তিনি। সেটি হল মাঝে মধ্যেই 'মৌনী ব্রত' অবলম্বন।

এই ঘটনায় বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ভ্রাতা যাদব আচার্যের দায়িত্ব আরো বৃদ্ধি পেল। 'শ্রীপাদ যাদবাচার্য্য ভগিনীর সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করেন। দামোদর পণ্ডিত নিত্যধামে গমন করার পর হইতে দেবীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার শ্রীপাদ যাদবাচার্য্য লইয়াছেন। তিনি প্রভুর সেবা ফেলিয়াও দুবেলা আসিয়া ভগিনীর তত্ত্বাবধারণ করিয়া যান।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এক্ষণে প্রকৃত সন্ন্যাসিনী। পূর্ণযোগিনী, প্রেমভক্তি-যোগ শিক্ষার তিনি পূর্ণ আদর্শস্থানীয়া। প্রভুর পদানুসরণ করিরা দেবী কঠোর হইতে কঠোরতম নিয়মানুসারে প্রেমভক্তি যোগের সাধনায় সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।' [বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত]

সমগ্র বৈষ্ণব ভক্ত সমাজের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ও তদারকি দায়িত্ব বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ধীরে ধীরে যাদব আচার্যের হাতে তুলে দিলেন। এ কাজগুলি পূর্বে পরলোকগত সেবকবৃন্দই করতেন। যাদব আচার্যের কাজের পরিধি অনেক বেড়ে যাওয়াতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যাদব পুত্র মাধব আচার্যকে চৈতন্যদেবের বিগ্রহ সেবা-পূজার দায়িত্ব তুলে দিলেন। অবশ্য তার আগে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী মাধব আচার্যকে 'দত্তক পুত্র' হিসেবে গ্রহণ করেন। এবং বীজমন্ত্র কানে দিয়ে দীক্ষান্তে তাকে শিষ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেন। শ্রীশান্তিময় গোস্বামী তার 'নবদ্বীপ দর্শন' গ্রন্থে লিখেছেন—'অন্তিমকালে তিনি স্বকীয় পুত্র প্রতিম

ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমাধবাচার্যকে দীক্ষা প্রদান করিয়া শ্রীবিগ্রহ সেবায় নিযুক্ত করেন।' বংশীশিক্ষায়—

—তবে দেবী শ্রীযাদব মিশ্রের নন্দনে।
নিয়োজিত করিলেন প্রভুর সেবনে ॥
ভাগ্যবান যাদব-নন্দন মহাশয়।
প্রভুর সেবার লাগি সকল ছাড়য় ॥

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী অন্য এক জগতে পদার্পণ করলেন। ইহলীলা সম্পন্ন করার বাসনা হল তাঁর। কর্তব্য কর্ম যা ছিল তা সমাপ্ত করেছেন। চৈতন্যদেবকে তুলে ধরবার জন্য তাঁর যা করণীয় তার অনেকটাই সাধিত হয়েছে। নিজজন বলতে রয়েছে যাদব, মাধব, সখীগণ প্রমুখ। মাতা মহামায়া, পিতা সনাতন মিশ্র ইহলোক ছেড়ে গেছেন বহুদিন। সবার কথা ভেবেই মনে মনে অনুশোচনা করেন তিনি। 'প্রাণবল্লভের বিষম বিরহজ্বালা আর তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না। দেবী কান্দিতে কান্দিতে একদিন মনে মনে প্রভুর শ্রীচরণান্তিকে একটু স্থান প্রার্থনা করিলেন। দয়াময় প্রভুর কর্ণে প্রাণপ্রিয়া অনাথিনী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কাতর নিবেদন পৌঁছিল। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বদন-চন্দ্রে যেন ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল। দেবী তাহা দেখিতে পাইলেন। তিনি প্রাণবল্লভের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সখী কাঞ্চনাকে কহিলেন, 'সখি! যাদবকে বল, আমি শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে একবার যাইয়া প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন ও স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইব। অদ্য শ্রীগৌর-পূর্ণিমা, প্রভুর জন্মদিন। মঙ্গল আরতি শেষ হইলে আমাকে শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে রাখিয়া কিছুক্ষণ দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে বল।' [বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত]

কথা মতই ব্যবস্থা হল। মঙ্গলারতির শেষে ব্রাহ্মমুহূর্তে সকলের চোখের সামনে মহাপ্রভু মন্দিরে স্থির বিদ্যুৎ শিখার মত শুভ্র বসন পরিহিতা যোগিনী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী প্রবেশ করলেন। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল। লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গলে'—

হাসিয়া সম্ভাষে প্রভু-আইস আইস বোলে।
পরম পিরীতি করি বসাইল কোলে ॥

তখন—

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভু-অঙ্গে চন্দন লেপিল।
অগুরু কস্তুরী-গন্ধে তিলক রচিল ॥ ৫৮৩ ॥ (ঐ)

মহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর—

সুন্দর ললাটে দিল সিন্দুরের বিন্দু।
দিবাকর কোলে যেন রহিয়াছে ইন্দু॥
... ...
ত্রৈলোক্যমোহিনী রূপ নিরীখে বদন।
অধর-মাধুরী সাধে করয়ে চুম্বন॥ (ঐ)
... ...

অতঃপর—

হৃদয় উপরে থোয় না ছুঁয়ায় শয্যা।
পাশ পালটিতে নারে দুহুঁ এক মজ্জা॥ (ঐ)

যুধিষ্ঠির জানা লিখেছেন—'বিষ্ণুপ্রিয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করলো গৌর মন্দিরে। তারপর লাগিয়ে দিল কপাট। বসল বিগ্রহের সামনে। নিমগ্ন হল গৌরধ্যানে। নাম জপ করতে করতে অবশ হয়ে এল তনু।'

[উপেক্ষিতা বিষ্ণুপ্রিয়া]

'মঙ্গল আরতির বাজনা তখন বাজিতেছে। বাহিরে ভক্তবৃন্দ জয়ধ্বনি করিতেছে। হরি সংকীর্তনের আনন্দ রোলে প্রভুর শ্রীমন্দির মুখরিত। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগলে মিলিত হইলেন, শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র, নবদ্বীপময়ীর সহিত একত্রীভূত হইলেন।' [বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত]

'কেটে গেল অনেকক্ষণ। তবু উন্মুক্ত হলো না মন্দিরের কপাট। কাঞ্চনা হয়ে উঠল উৎকণ্ঠিতা। ডেকে আনল যাদবকে। এসে যাদব খুললো মন্দিরের কপাট। ছুটে এল সকলে। দেখল চিরবিরহিনী উপেক্ষিতা বিষ্ণুপ্রিয়া গৌর বিগ্রহের সম্মুখে মহাসমাধিস্থ। হাহাকার করে উঠল সকলে। করুণ কণ্ঠে ডাকল যাদব—

—দিদি। দিদি।

না, কোন সাড়াশব্দ নেই। দেহে নেই কোন স্পন্দন। পড়ে রয়েছে দেহটা। দেহী নেই। সব শেষ। দুঃখ শ্রান্ত বিরহিনী প্রিয়ার উপেক্ষিত জীবনের ঘটেছে চির সমাপ্তি। গৌরবক্ষ বিলাসিনী গৌর বক্ষে লাভ করেছে শান্তি।' [উপেক্ষিতা বিষ্ণুপ্রিয়া]

'...খবর পেঁছুতে দেরী হল না। অগণিত জনস্রোত এসে লুটিয়ে পড়ল দ্বারপ্রান্তে। আকাশে, বাতাসে একটি রব শুধু ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে, মা, মা, মাগো মা, জননী। তারপর বেদনা বিজড়িত চক্ষে অশ্রুপ্লাবিত বক্ষে করজোড়ে নত হয়ে ভুলুণ্ঠিত হয়ে, শেষ প্রণাম জানাল সকলে মাকে।

স্বামীর পাদুকা দুটি বক্ষে নিয়ে শ্রীবিষ্ণুর পদপ্রান্তে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন মা, এই ঘুম—এর চিরনিদ্রা। সৌম্য শান্ত শীর্ণ চেহারাখানিতে পরম পরিতৃপ্তির চিহ্ন। এই ঘুম, স্বামীর পদপ্রান্তে এই শেষ ঘুম। আর জাগবেন না মা।' [নবদ্বীপ দীপশিখা বিষ্ণুপ্রিয়া]

হরিদাস গোস্বামী লিখেছেন—'প্রভু আমার শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন; শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার প্রাণবল্লভের সহিত সম্মিলিতা হইলেন। এ শুভ মিলন স্বাভাবিক, এ যুগল-মিলন প্রভুর ইচ্ছাতেই সংঘটিত হইল।……নবদ্বীপময়ী, নবদ্বীপচন্দ্রের সহিত সম্মিলিতা হইয়া মধুর মনোমোহনরূপে নদীয়াধাম আলোকিত করিলেন। শ্রীধামে যুগল-মিলন মূর্ত্তি প্রকাশ হইল।' [বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত]

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ইহলীলা সাঙ্গ করা নিয়ে মাত্র একটি কিংবদন্তীই প্রচলিত আছে। 'গৌরদীপিকা'য় দেখি সাধিকা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে চৈতন্যদেব দেববাণীর দ্বারা বলছেন—

'প্রিয়তমে বিষ্ণুপ্রিয়ে।
ব্রাহ্মমুহূর্তে আজি দারুমূর্তে লীন।
হবে তুমি মোর অঙ্গে, (নহি) তুমি আমি ভিন্।'

[গম্ভীরায় বিষ্ণুপ্রিয়া—হরিদাস গোস্বামী, থেকে সংগৃহীত]

বৈষ্ণব ভক্তজনেদের বিশ্বাস চৈতন্যদেবের আদেশমত সবার কাছ থেকে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বিদায় নিয়ে, তাঁরই তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত, সেবিত ও পূজিত দারুবিগ্রহে তিনি মিলিত হয়েছেন। কবি ধূপরাজ তাঁর 'বিষ্ণুপ্রিয়া মঙ্গলে' বলেছেন—

'প্রবেশিলা বিষ্ণুপ্রিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে।
পড়িল কবাট তবে অতি ধীরে ধীরে॥
ব্রাহ্ম মুহূর্তে প্রভুর জন্মদিনে।
দারুমূর্তে লীন দেবী হইলা আপনে॥'

[গম্ভীরায় বিষ্ণুপ্রিয়া থেকে সংগৃহীত]

এই কিংবদন্তী সম্পর্কে যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গ্রন্থে ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য বলেছেন 'বৈষ্ণব সাধক, মহাজন এবং চৈতন্যভক্তদেরও শ্রীচৈতন্যের মত অলৌকিক প্রয়াণ বর্ণনা করা বৈষ্ণবীয় গ্রন্থকারদের একটা রোগ বিশেষ।'

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর তিরোধানের তারিখ নিয়ে এ যাবত একাধিক তথ্য পাওয়া গেছে। তিরোধানের সঠিক তারিখ এখনও পর্যন্ত উদ্ঘাটিত হয়নি।

প্রভুপাদ নিমাইচাঁদ গোস্বামী তার 'শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ শক্তি মা জাহ্নবা' গ্রন্থে বলেছেন, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ১৪৯৭ শকাব্দে অদর্শন হন। অর্থাৎ ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ বা ৯৮২ বঙ্গাব্দ। এই হিসেব ধরলে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ৮২ বছর ইহলোকে অবস্থান করেছিলেন। আবার 'নবদ্বীপ বার্ত্তা'-র সম্পাদক গৌরাঙ্গচন্দ্র কুণ্ডু 'চৈতন্যবিগ্রহের উত্তরাধিকার' প্রবন্ধে লিখেছেন—১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী অপ্রকট হন। অতএব ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ বা ৯৯৬ বঙ্গাব্দকে অপ্রকট সময় ধরলে তখন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বয়স হয় ৯৬ বছর। আশা করি, অচিরেই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মহাপ্রয়াণের সঠিক তারিখ উদ্ঘাটিত করতে পারবো।

স্বভাবতই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পাঞ্চভৌতিক দেহের বিনাশ এবং তার পরিণতি সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মহাপ্রয়াণের পর তাঁর আরাধ্য পাদুকাযুগল স্থান পেয়েছিল মহাপ্রভুর মূর্তির পাদদেশে তথা সিংহাসনের ওপর। এবং আরও মজার বিষয় মাধব আচার্য তখন থেকেই রাত্রিকালীন পূজো আরাধনান্তে মন্দিরের মধ্যেই গৌর-বিষ্ণু-প্রিয়ার 'শয়ন বিলাস' নিয়মিত করলেন। আজও সে ধারা অব্যাহত। শুধু তাই নয়, এই মন্দিরেই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তখন থেকেই মহাপ্রভুর সঙ্গে যুগলে নিত্য পূজা পেয়ে আসছেন।

'গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল পূজার মন্ত্র নিম্নে বর্ণিত হল—

শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াযুগলধ্যানম্

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শুভ্রযজ্ঞোপবীতিনম্।
ধ্যায়েদ্বিশ্বম্ভরং বিষ্ণুপ্রিয়ালিঙ্গিতবিগ্রহম্॥

শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াধ্যানম্

স্বর্ণবর্ণং সদানন্দং দিব্যোপবীতধারিণম্।
চন্দনালিপ্তসর্বাঙ্গং শচীপুত্রং নরোত্তমম্।
দ্বিজশ্রেষ্ঠং চ বরদং দিব্যতিলকশোভিনম্।
বিষ্ণুপ্রিয়াযুতং গৌরং নাগরীগণবেষ্টিতম্॥
প্রেমানন্দময়ং প্রেমদায়িনং ভক্তবৎসলম্।
প্রসন্নবদনং দেবং বরদং প্রেমরূপিণম্॥

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীধ্যানম্

তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং চন্দ্রকান্তিসমপ্রভাম্।
সিন্দূরবিন্দুশোভাঢ্যাং নানালংকারভূষিতাম্॥
পট্টবস্ত্রপরীধানাং শঙ্খকঙ্কণধারিণীম্।
সনাতনসুতাং দেবীং গৌরভক্তিপ্রদায়িনীম্॥

গায়ত্রী

ওঁ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায়ৈ বিদ্মহে ভক্তিরূপায়ৈ ধীমহি
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

যুগলমন্ত্রঃ

ক্লীং বিষ্ণুপ্রিয়াগৌরাঙ্গাভ্যাং স্বাহা।

প্রণামঃ

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং বৈষ্ণবীশক্তিরূপিণীম্।
সনাতনসুতাং দেবীং প্রণমামি প্রভুপ্রিয়াম্॥
গৌরাঙ্গবল্লভাং দেবীং ভক্তাভীষ্ট প্রদায়িনীম্।
নবদ্বীপেশ্বরীং সাধ্বীং গৌরবক্ষোবিলাসিনীম্॥

যুগলপ্রণামঃ

ওঁ নমো বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ নমস্তে শচিনন্দন।
নমো বিষ্ণুপ্রিয়াদেব্যৈ গৌরশক্ত্যৈ নমো নমঃ॥
গৌরায় গৌরচন্দ্রায় নবদ্বীপ বিহারিণে।
নমো লক্ষ্ম্যৈমহাদেব্যৈ মহাসাধ্ব্যৈ নমো নমঃ॥

যুগলশয়ন মন্ত্র ঃ

বন্দে তং গৌরচন্দ্রেশং বামে প্রিয়াসমন্বিতম্।
নমো বিষ্ণুপ্রিয়েশায় নিদ্রাং ভজ মহাপ্রভো॥

ভক্তজনের দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রচলিত কিংবদন্তী অনুযায়ী একই মূর্তিকে সাজানো হয় কখনও 'ধামেশ্বর মহাপ্রভু' হিসেবে, আবার কখনও 'ধামেশ্বরী

বিষ্ণুপ্রিয়া' হিসেবে। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কাছে ভক্তজনেরা মন্দিরে মানত করে। আশা পূরণ হ'লে এই মূর্তিকেই তারা শাঁখা, সিঁদুর, আলতা, শাড়ি পরিয়ে সাজায়। ভোগ নিবেদন করে। নিত্য পূজা ছাড়া প্রতি বছর মাঘী পঞ্চমীতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মদিন এখানে পালিত হয়। তেমনি ফাল্গুন মাসের দোলপূর্ণিমা তিথিতেও মহা ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয় মহাপ্রভুর শুভ জন্মদিন। আবার বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবারের সঙ্গে চৈতন্যদেবের যেহেতু 'জামাই' সম্পর্ক সে হেতু জ্যৈষ্ঠ মাসে 'জামাই ষষ্ঠীর' দিন চৈতন্যদেবকে এই মন্দিরে দেওয়া হয় 'ষষ্ঠীবাটা।'

শুধু যে মাধবাচার্যের বংশধরগণ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পূজা করে তা নয়। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বরপুত্র শ্রীনিবাস আচার্য পরিবারের অনেকেই বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকেই তাদের আরাধ্যা দেবী হিসেবে বরণ করে নিয়েছে। ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে 'গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার' যুগলমূর্তি তখন থেকেই প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে। উল্লেখ্য, নিত্যানন্দ-গৃহিণী জাহ্নবা দেবীর নেতৃত্বে ঠাকুর নরোত্তমের শ্রীপাট 'খেতুরীতে' প্রথম গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া 'যুগল মূর্তি' স্থাপিত হয়। বলা প্রয়োজন, অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী শহরের প্রাচীন নাম ছিল রামপুরবোয়ালিয়া। এই শহরের ছয় ক্রোশ দূরে গড়ের হাট পরগণার অন্ত-র্গত গ্রাম 'খেতুরী', পদ্মার তীরে অবস্থিত। এই স্থানের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত, উপাধি মজুমদার। কৃষ্ণানন্দ হলেন ঠাকুর নরোত্তমের পিতা। নবদ্বীপে 'গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া'র বিবাহে যেমন রাজকীয় আয়োজন হয়েছিল ঠিক তেমনি আয়োজন হয়েছিল 'গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া' যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও। শ্রীসমরেন্দ্র'র 'ঠাকুর নরোত্তম' গ্রন্থে দেখি—'এদিকে শ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল-মূর্তি ও বল্লভীকান্ত স্থাপনের আয়োজন হতে লাগল। ঠাকুর মহাশয় ও তাঁর শিষ্যমাত্রেই আনন্দে উন্মত্ত হলেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ স্থির করলেন যে, এই মূর্তি স্থাপন উপলক্ষ্যে যে মহোৎসব করবেন তাঁর মত কেউ কখনও করতে পারেন নি। রাজা এই উপলক্ষ্যে সর্বস্ব ব্যয় করবার সংকল্প করলেন।' আনুমানিক ১৫০৪ শকাব্দ, ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, ৯৮৯ বঙ্গাব্দের ৩০শে ফাল্গুন চৈতন্যদেবের জন্মতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমার যুগল মূর্তি স্থাপিত হয়। এটিও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

ফিরে আসা যাক বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সাধনপীঠ নবদ্বীপ এবং তাঁর পূজিত, সেবিত ও মিলিত বিগ্রহ প্রসঙ্গে। প্রভুপাদ হরিদাস গোস্বামীর 'শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নীলাচললীলা' গ্রন্থে ধামেশ্বর মূর্তি ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর লীলা সঙ্গোপন

প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'নিত্যধাম নবদ্বীপের শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সেবিত শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তির অপরূপ রূপসৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে জগজ্জনমন প্রাণহরণ করে,—এই শ্রীমূর্ত্তির মহিমা সর্ব্বজনবিদিত, সর্ব্বজগৎ ব্যপ্ত। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিতবপু শ্রীগৌরমূর্ত্তি এক্ষণে 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ালিঙ্গিত বিগ্রহং' এবং এই জন্যই "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং" শ্রীমূর্ত্তির এক্ষণে এত ঔজ্জ্বল্য, এত মাধুর্য্য, এত হৃদয়োন্মাদিনী ভাবসম্পদবিশিষ্ট।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ নদীয়াযুগল শ্রীমূর্ত্তিই শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ মূর্ত্তি ইহাই তাঁহার আদিরূপ বা স্বয়ংরূপ। স্বয়ং রূপে সশক্তি স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তাঁহার নিত্যধাম নবদ্বীপে পূর্ণ প্রকাশ হইয়া তাঁহার পরিপূর্ণ আনন্দঘন মূর্ত্তিতে বিরাজমান। তাঁহার লীলাসঙ্গোপন লৌকিকী লীলারঙ্গ মাত্র।'

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অষ্টসখী ও অন্যান্য

সাধিকা জীবনে মহাবৈষ্ণবী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যে শ্রীরাধার মতই সর্বদা অষ্টসখী পরিবৃতা হয়ে থাকতেন একথা পূর্ব পরিচ্ছেদে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সুদীর্ঘ সাধিকা জীবনে তাঁকে চন্দ্রবলয়ের মত ঘিরে থাকতে দেখা যায় কাঞ্চনা, মনোহরা, সুকেশী, চন্দ্রকলা, অমিতা, সুরসুন্দরী, প্রেমলতিকা ও সখি বিষ্ণুপ্রিয়াকে। এই সখী তথা সেবিকামণ্ডলী সম্পর্কে প্রভুপাদ মধুসূদন গোস্বামী সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দে হাতে লেখা পুরনো পত্রিকায় সুললিত বর্ণনা দিয়েছেন। তপস্বিনী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে কেন্দ্র করে যে সেবিকামণ্ডলী গড়ে উঠেছিল, তার ব্যাপ্তি ও প্রসারতা কতদূর বিস্তৃত ছিল সে পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এই সখীমঞ্জরী বর্ণনায়। প্রতি সখী এতই আকর্ষক, জনপ্রিয় ও প্রভাবশালিনী ছিল যে তাদেরও আবার অন্তরঙ্গ অষ্টসখী ছিল। স্বভাবতই এই সখীমঞ্জরী বর্ণনায় আমরা দেখতে পাব আরও চৌষট্টিজন বৈষ্ণবীকে। এই চৌষট্টি জন সখী সহ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অষ্ট সখীকে যোগ করলে মোট সখীর সংখ্যা হয় বাহাত্তর জন। এই বাহাত্তর জনেরই মূল আকর্ষণ তথা আরাধ্যা দেবী হলেন 'বিষ্ণুপ্রিয়া'। আর আরাধ্য দেবতা স্বয়ং 'গৌরসুন্দর'। এখানে মোট আট জন সখীর চিহ্নিত সখীগণকে নিয়ে নামের সাথে মিল রেখে পরম্পরায় রচিত হয়েছে আলাদা আলাদা আটটি পদ। সংস্কৃত থেকে বাংলায় এর অনুবাদ করেছেন বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রণেতা প্রভুপাদ হরিদাস গোস্বামী মহাশয়। শুধুমাত্র নামের তালিকা সন্নিবেসিত না করে তার রচিত 'শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার অষ্টকালীয় স্মরণ মনন পদ্ধতি" গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশ থেকে শ্রুতি মধুর পদ গুলি এখানে তুলে ধরা হল। বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অন্তরঙ্গ কনিষ্ঠ সখীর নামও ছিল বিষ্ণুপ্রিয়া। গৌরাঙ্গদেব প্রেয়সী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সঙ্গে তার পার্থক্য বোঝাবার জন্যই অন্যান্য সখীগণ তার নামের আগে জুড়ে দিয়েছিল একটি 'সখি' শব্দ। তখন থেকেই সে পরিচিত হয় 'সখি বিষ্ণুপ্রিয়া' নামে। এবার আসা যাক সখীগণের মঞ্জরী বর্ণনায়—

কাঞ্চনা— ইন্দিরা শ্রীকুরঙ্গাক্ষী দেবীহেমলতা।
বিদ্যুল্লতা কাত্যায়ণী আর কৃষ্ণমাতা॥

কৃষ্ণকান্তা শৈলবালা কাঞ্চনা সমাজে।
এই অষ্টসখী খ্যাতি রহে জগ মাঝে ॥

মনোহরা— কোমলাঙ্গী চারুবালা শ্রীমঞ্জুভাষিনী।
দীর্ঘকেশী বিশালাক্ষী শ্রীমনমোহিনী ॥
তিলোত্তমা সুররমা এই অষ্ট জনা।
মনোহরা সখি সবে না জানে আপনা ॥

সুকেশী — সুরবালা সুকুমারী গোলোকবাসিনী।
ললিতা লবঙ্গলতা সুচারুহাসিনী ॥
সুরধুনী জগম্মাতা সুকেশী যুথেতে।
হয় এই অষ্টসখি সখি মননেতে ॥

চন্দ্রকলা— হৈমবতী হেমকান্তি আর সুশোভনা।
চন্দ্রমুখী চন্দ্রভাগা শ্রীচন্দ্রবদনা ॥
কলকণ্ঠী সুভাননা চন্দ্রকলা সখি।
সখি অনুকূল সদা সখিগণ লখি ॥

অমিতা— শ্রীমাধবী প্রিয়ম্বদা আর সুচরিতা।
শ্রীরূপমঞ্জরী সরস্বতী বেদমাতা ॥
সত্যভামা শ্রীরুক্মিনী অমিতার সখি।
গৌরাঙ্গ সেবয়ে সদা সখি মন রাখি ॥

সুরসুন্দরী— সুলোচনা ব্রজবালা উর্ম্মিলা মেনকা।
প্রতিভা গায়ত্রী শ্যামা সখি সুগন্ধিকা ॥
এ সবার যুথেশ্বরী শ্রীসুরসুন্দরী।
গৌরাঙ্গ সেবনে যার অনুরাগ ভুরি ॥

প্রেমলতিকা— চপলা শ্রীসুধামুখী রাধা রাসেশ্বরী।
শান্তি ক্ষেমঙ্করী কৃষ্ণা দেবীমহেশ্বরী ॥
শ্রীপ্রেমলতিকা সখি এই অষ্ট জনে।
সর্ব্বদা সখির কার্য্য করে প্রাণ পনে ॥

সখি বিষ্ণুপ্রিয়া— কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী শ্যামা রমা চন্দ্রমুখী।
সুন্দরী সুমধ্যা ভদ্রা আর প্রিয়মুখী ॥
সখি বিষ্ণুপ্রিয়া সখি একয় যুবতী।
সখি অনুকূলে সেবে প্রেমের মুরতি ॥

বিষ্ণুপ্রিয়া সহস্রনামামৃত

ইষ্টদেবী হিসেবে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বিভিন্ন ভক্তজনের কাছে পরিচিত হয়েছিলেন বিভিন্ন নামে। তাঁর সেই নামাবলী সংগৃহীত করে হরিদাস গোস্বামী রচনা করেছেন একটি গ্রন্থ। নাম দিয়েছেন 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—সহস্রনাম স্তোত্রম্'। এই সহস্র নাম স্তোত্র গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভক্তমণ্ডলীর কাছে খুবই আকর্ষণীয় তত্ত্ব এবং তথ্যও বটে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভক্তজনেদের মধ্যে এই সহস্রনামস্তোত্রমালা প্রচলনের জন্য হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় অনূদিতও হয়েছে। বাংলাভাষাসহ অন্যান্য ভাষায় অনূদিত গ্রন্থগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য। সেজন্য উক্ত সহস্রনামাবলী উৎসাহী পাঠক বর্গের উদ্দেশে সন্নিবেশিত হল এই গ্রন্থে।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহস্রনামস্তোত্রম্

অন্নদাত্রী চান্নপূর্ণা অনন্তপ্রেমসাগরা।
অনাদিরাদিপ্রকৃতিরনন্তগুণশালিনী ॥ ১ ॥
অমিতাদিসখীযুক্তা অচিন্ত্যাদ্ভুতরূপিনী।
অদোষদর্শিনীদেবী অনন্তা হ্যখিলেশ্বরী ॥ ২ ॥
আহ্লাদিনীসারভূতা আপ্রপাতকিতারিণী।
আপদুদ্ধারিনী হ্যাদ্যা আচাণ্ডালপ্রপাবনী ॥ ৩ ॥
আদ্যাশক্তিস্বরূপাবৈ আরাধ্যা সর্বদেবতা।
আব্রহ্মাদিদেবপূজ্যা সর্বাশান্তিবিনাশিকা ॥ ৪ ॥
ইন্দ্রপূজ্যা চেষ্টদেবী ইষ্টমন্ত্রস্বরূপিনী।
ইচ্ছাময়ীচ্ছাশক্তিশ্চ ইচ্ছারূপা সনাতনী ॥ ৫ ॥
ঈশভক্তিপ্রদাদেবী ঈশানেন প্রপূজিতা।
ঈশ্বরী চেশ্বরপ্রেষ্টা ঈশশক্তিপ্রদায়িনী ॥ ৬ ॥
উমেশবন্দিতা পূজ্যা উত্তমৈশ্বর্য্যদায়িনী।
ওঁকাররূপিনী হ্যার্য্যা অষ্টসিদ্ধিপ্রদায়িনী ॥ ৭ ॥
করুণার্ণবরূপা চ করুণারসবর্ষিণী।
কমলাঙঘ্রী কনকাঙ্গী কামবীজস্বরূপিণী ॥ ৮ ॥
কম্রকান্তিময়ীদেবী কমলা কমলাননা।
কন্দর্পদমনীরামা কাত্যায়নী কৃপাকরি ॥ ৯ ॥
কিলাকিঞ্চিতভাবাঢ্যা কিশোরী কৃষ্ণসেবিকা।
কীর্তিদা কীর্ত্তনপ্রিয়া কলিকিল্বিষনাশিনী ॥ ১০ ॥

কুন্ডলিনীশক্তিরূপা কুললক্ষ্মীঃ কুলাঙ্গনা।
কৃষ্ণপ্রেমময়ীবালা কৃষ্ণশক্তিস্বরূপিণী ॥ ১১ ॥
কৃষ্ণভক্তা কৃষ্ণকান্তা কালভীতিনিবারিণী।
কামবীজাম্বিকাদেবী কাঞ্চনাদিসখীপ্রিয়া ॥ ১২ ॥
কাঞ্চনাদিকৃপাদাত্রী কামভীতিবিনাশিকা।
কান্ত্যাঢ্যা কামিনী কম্রা কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ॥ ১৩ ॥
কৃষ্ণসেবারতিঃ কৃষ্ণা কৃষ্ণসেবাপরায়ণা।
কৃষ্ণানন্দপ্রদায়িনী ॥ ১৪ ॥
কৃষ্ণভক্তিপ্রিয়ারম্যা কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়িনী।
কৃষ্ণচৈতন্যপরমা নবদ্বীপবিহারিণী ॥ ১৫ ॥
কৃষ্ণশক্তিধরাদেবী পরানন্দপ্রদায়িনী।
কৃষ্ণভাবপ্রদাধন্যা কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা ॥ ১৬ ॥
কৃষ্ণানুগ্রহদাত্রী চ কৃষ্ণভক্তিস্বরূপিণী।
কৃষ্ণচৈতন্যমহিষী কারুণ্যামৃতবর্ষিণী ॥ ১৭ ॥
কৃষ্ণানুরাগিণীরামা রাধাভাবপ্রকাশিকা।
কৃষ্ণপিযূষরসিকা কৃষ্ণানন্দপ্রদায়িনী ॥ ১৮ ॥
কৃষ্ণপ্রেমভৈক্ষ্যদাত্রী শ্রীকৃষ্ণকরুণাকরা।
কৃষ্ণপ্রেমাম্ভোধিমগ্না কৃষ্ণপ্রেমপ্রবর্দ্ধিনী ॥ ১৯ ॥
কৃষ্ণভক্তসঙ্গপ্রিয়া কৃষ্ণলীলাবিভাবিনী।
কৃষ্ণস্যাহ্লাদিনীদেবী কৃষ্ণসৌখ্যবিলাসিনী ॥ ২০ ॥
খগেন্দ্রবন্দিতাদেবী খঞ্জনাক্ষীমনোরমা।
গৌরচন্দ্রপ্রাণপ্রিয়া গীর্বাণী গতিদায়িনী ॥ ২১ ॥
গৌরশক্তির্গৌরকামা গৌরভক্তিপরায়ণা।
গৌরপ্রেমময়ীবালা গৌরাঙ্গমতিমোহিনী ॥ ২২ ॥
গৌরাঙ্গগৃহিনী গৌরী গৌরাঙ্গপ্রাণবল্লভা।
গৌরাঙ্গপ্রেয়সীধন্যা গৌরপ্রেমপ্রদায়িনী ॥ ২৩ ॥
গৌরবক্ষঃস্থিতাদেবী গৌরাঙ্গানন্দদায়িণী।
গৌরাঙ্গবল্লভারামা গৌরধ্যানপরায়ণা ॥ ২৪ ॥
গৌরপ্রাণেশ্বরীলক্ষ্মী গৌরিপ্রেমতরঙ্গিণী।
গৌরানুরাগিণীদেবী গৌরাঙ্গগুণগায়িকা ॥ ২৫ ॥
গৌরাঙ্গসেবিনীনিত্যা সদাগৌরকুতূহলা।
গৌরাঙ্গমহিষীপূর্ণা গৌরপ্রেমরসার্ণবা ॥ ২৬ ॥
গৌরপ্রেমরসোন্মত্তা গৌরাঙ্গপ্রাণতোষিণী।
গৌররসেসদামগ্না গৌরসুন্দরমোহিনী ॥ ২৭ ॥

গৌরানন্দসদানন্দা গৌরবক্ষোবিলাসিনী।
গৌরাঙ্গবিরহোন্মত্তা গৌরাঙ্গপ্রিয়বাদিনী ॥ ২৮ ॥
গৌরামৃতরসেমগ্না গৌরনামপ্রচারিণী।
গৌরসেব্যা গৌরময়ী গৌরাঙ্গপদসেবিনী ॥ ২৯ ॥
গৌরচিত্তা গৌররামা গৌরাঙ্গরসভাবিতা।
গৌরাঙ্গী গৌরকান্তা চ গৌরগোবিন্দগেহিনী ॥ ৩০ ॥
গৌরেশ্বরী চিদানন্দা গৌরাঙ্গপদভাবিনী।
গৌরমণ্ডল্যধিষ্ঠাত্রী গৌরদা গুণসাগরা ॥ ৩১ ॥
গৌরপ্রাণাধিকা গীতা গান্ধর্বা গর্বহারিণী।
গৌরপ্রাণেশ্বরী গোত্রী গৌরলীলাসহায়িকা ॥ ৩২ ॥
গৌরাঙ্গসর্বস্বপূজ্যা গৌরচন্দ্রপ্রিয়েশ্বরী।
গৌরাঙ্গনাগরপ্রিয়া নবগৌরী সুশোভনা ॥ ৩৩ ॥
গৌরাঙ্গমধুমাধুর্য্যা গৌরকৃষ্ণমনোরমা।
গৌরচন্দ্রপ্রাণপ্রিয়া গরিষ্ঠা গুণসাধিকা ॥ ৩৪ ॥
গোগোপবৎসলাদেবী গৌরাঙ্গেরতিদায়িকা।
গৌরাঙ্গচরণাসক্তা গৌরাঙ্গগণপূজিতা ॥ ৩৫ ॥
গৌড়েশ্বরী গৌরসখী গুণধামা গরীয়সী।
গৌরগতির্গৌরবশ্যা গৌরসৌখ্যাভিলাষিণী ॥ ৩৬ ॥
গৌরচন্দ্রপ্রিয়ত্তমা গৌরাঙ্গহৃদবাসিনী।
গৌরদেবপ্রাণপ্রিয়া গৌরগোপালভাবিনী ॥ ৩৭ ॥
গর্ব্বিণী গায়িকা গন্ধর্বী গৌরচন্দ্রবিনোদিনী।
গুণালয়া গুণকরী গঙ্গাদর্শনকাঙ্ক্ষিণী ॥ ৩৮ ॥
গঙ্গারূপা গঙ্গাভক্তা গঙ্গাভক্তিতরাঙ্গিণী।
গঙ্গাতটনিবাসা চ গঙ্গাসলিলসেবিনী ॥ ৩৯ ॥
গুণাতীতা গুণময়ী গৃহলক্ষ্মীঃ শুভঙ্করী।
গোস্বামিগণবন্দ্যা চ গায়ত্রী গৌরবান্বিতা ॥ ৪০ ॥
ঘনানন্দময়ীদেবী ঘনশ্যামঘটস্থিতা।
ঘোরপাপপরিত্রাত্রী চিদ্‌ঘনা চিচ্ছুবরূপিণী ॥ ৪১ ॥
চতুঃষষ্ঠিকলাবিজ্ঞা চতুর্বেদবিশারদা।
চারুগোরোচনাগৌরী চারুচন্দ্রনিভাননা ॥ ৪২ ॥
চিন্ময়ী চিদ্‌ঘনানন্দা চৈত্তচৈতন্যকারিণী।
চৈতন্যরূপিণী চার্বী চৈতন্যচিরসঙ্গিনী ॥ ৪৩ ॥
চৈতন্যজীবনাদেবী চতুর্বর্গপ্রদায়িনী।
চিন্তাতীত চারুশীলা চন্দ্রকান্তিসমপ্রভা ॥ ৪৪ ॥
চম্পকপুষ্পবর্ণাভা চতুরা চিত্তহারিণী।

চরাচরেশ্বরীদেবী চিন্তাজ্বরনিবারিণী ॥ ৪৫ ॥
ছন্দোবন্ধ্যা কাব্যময়ী স্বচ্ছন্দা গৃহচারিণী।
জগন্ময়ী জগদ্ধাত্রী জগদানন্দকারিণী ॥ ৪৬ ॥
জগন্নাথপুত্রবধূর্জাহ্নবীবসুধাপ্রিয়া।
জন্মমৃত্যুহরাদেবী সম্পূজ্যা জগদীশ্বরী ॥ ৪৭ ॥
জয়প্রসূর্জগল্লীলা জয়শ্রীর্জয়ধায়িনী।
জগদম্বা জগচ্ছক্তির্জয়দা জগতাম্প্রসূঃ ॥ ৪৮ ॥
জগদ্রূপা জগন্নেত্রী জগত্তারা জয়ংকরী।
জগচ্চিন্ত্যা জগতপূজ্যা জগদাধাররূপিণী ॥ ৪৯ ॥
ঝণন্নূপুরপাদাব্জা প্রেমনির্ঝররূপিণী।
টলমলাগৌরপ্রেমাঢ্যা অচলা ধৈর্যশালিনী ॥ ৫০ ॥
ঠক্কুরার্যা পাকপটুর্নামহট্টপ্রকাশিনী।
ডিণ্ডিমেন স্বভক্তেন জয়গৌরবিঘোষিণী ॥ ৫১ ॥

ঢলঢলাপ্রেমভাবাঢ্যা শ্রীহট্টবসতিপ্রিয়া।
তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গী তমোগুণবিনাশিনী ॥ ৫২ ॥
তিলকধ বৈষ্ণবী ত্রিলোকীমঙ্গলপ্রদা।
ত্রৈলোক্যতারিণীদেবী বিধাত্রী ত্রিদশেশ্বরী ॥ ৫৩ ॥
তুলসীসেবনানন্দা তুলসীমাল্যধারিণী।
তুলসীচয়নপ্রীতা তুলসীবনচারিণী ॥ ৫৪ ॥
ত্রিগুণাধাররূপা চ ত্রয়ী ত্রাত্রী তপস্বিনী।
তীর্থেশ্বরী তীর্থময়ী তীর্থমূলপদদ্বয়া ॥ ৫৫ ॥
তেজস্বিনী ত্রিকালজ্ঞা তাপত্রয়নিবারিণী।
তারিণী তাপবিচ্ছেত্রী ত্রিবর্গফলদায়িনী ॥ ৫৬ ॥
স্থিতিঃসৃষ্টিঃপালয়িত্রী স্থিরা ধীরা মনোরমা।
স্থিরসৌদামনীরূপা গঙ্গাস্নানপ্রিয়া শুভা ॥ ৫৭ ॥
দয়াময়ী দয়াধারা দীনদুঃখনিবারিণী।
দাক্ষায়ণী মহাদুর্গা দিব্যালংকারভূষিতা ॥ ৫৮ ॥
দিব্যবেষা দীনধাত্রী দিব্যভূষণধারিণী।
দয়াশীলা দ্বারকেশী সর্বদুঃখবিনাশিনী ॥ ৫৯ ॥
দেবদেবী মহাদেবী বেণীবন্ধা বিনোদিনী।
দৈবশক্তিপ্রদাত্রী চ সর্বদেবপ্রপূজিতা ॥ ৬০ ॥
দেবতানাংদুরারাধ্যা দরিদ্রপ্রতিপালিকা।
দোর্দণ্ডোদ্দণ্ডরূপা চ বিদ্যারূপা বিদাংবরা ॥ ৬১ ॥
ধর্মসংস্থাপিনীদেবী ধ্যানমগ্না ধুরংধরা।

ধ্যানাতীতা ধর্মধাত্রী ধর্ম্মদা ধর্ম্মরূপিণী ॥ ৬২ ॥
ধরিত্রীরূপিণী ধাত্রী ধনহীনেধনপ্রদা ।
ধর্মাধিকারিণী ধন্যা ধনপুত্রপ্রদায়িনী ॥ ৬৩ ॥
ধ্রুবানন্দপ্রদাদেবী যুগধর্মপ্রচারিণী ।
ধূরিধূসরসর্বাঙ্গী বিরহেধরণীশয়া ॥ ৬৪ ॥
ধীরা সাধ্বী ধীরধীরা ধর্মমার্গপ্ররক্ষিণী ।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাব্জাঙ্ঘ্রিরেশক্যঘটনাপটুঃ ॥ ৬৫ ॥
নবদ্বীপেশ্বরীদেবী নরশক্তিপ্রকাশিনী ।
নবদ্বীপময়ী গৌরী পরমা নর্মদায়িনী ॥ ৬৬ ॥
নদিয়ানাগরীশ্রেষ্ঠা নবীনা নবযৌবনা ।
নবদ্বীপরসোম্মাদা নাগরীকুলমঞ্জরী ॥ ৬৭ ॥
নবদ্বীপভাবময়ী নাগরীণাংশিরোমণিঃ ।
নারায়ণী নববালা নবদ্বীপরসাশ্রিতা ॥ ৬৮ ॥
নদিয়ানন্দদা পূজ্যা নিত্যরূপা নতাননা ।
নবদ্বীপনিবাস চ সনাতনকুমারিকা ॥ ৬৯ ॥
নবদ্বীপেন্দ্রপত্নী চ নির্বিকারা নিরাময়া ।
নববৃন্দাবনানন্দা নরেশী চ নিরঞ্জনী ॥ ৭০ ॥
নবদ্বীপাধিদেবী চ নিরাকাঙ্ক্ষা নিতম্বিনী
নরনারায়ণপ্রীতা নীলাম্ভোরুহলোচনা ॥ ৭১ ॥
নবগোরোচনাগৌরী নারায়ণপদেরতা ।
নার্য্যুত্তমা নরপ্রীতা নামপ্রেমপ্রদায়িনী ॥ ৭২
নানারত্নপ্রদীপ্রদীপ্তাঙ্গী নির্ম্মলা মতিদায়িনী
নিত্যানন্দময়ী নিত্যা নিত্যানন্দপ্রদায়িনী ॥ ৭৩ ॥
নীলবস্ত্রপরীধানা নিগূঢ়রসসাধিকা ।
নানাশাস্ত্রসুনিষ্ণাতা নিমাইচিত্তমোহিনী ॥ ৭৪ ॥
পতিতোদ্ধারিণীদেবী পরিপুষ্টিপ্রদায়িনী ।
পতিতাপাবনী পুণ্যা প্রেমদাত্রী প্রভাবতী ॥ ৭৫ ॥
পতিভক্তিমূর্তিমতী পতিসেবাপরায়ণা ।
পরিপূর্ণা পরাভক্তিঃ পদ্মপ্রতিমলোচনা ॥ ৭৬ ॥
পদ্মজা পদ্মহস্তা চ পূর্ণপাতকনাশিনী ।
পরমপ্রীতিদাত্রী চ পরেশানী পরাৎপরা ॥ ৭৭ ॥
প্রচ্ছন্নপ্রভুনারী চ প্রচ্ছন্না প্রকৃতিঃপরা ।
প্রেমময়ী প্রেমরূপা প্রেমভক্তিস্বরূপিণী ॥ ৭৮ ॥
পবিত্রাণাং পবিত্রা চ পাপসংহারকারিণী ।
প্রাণেশপাদুকাসেবাপরা পীড়ানিবারিণী ॥ ৭৯ ॥

প্রেমভক্তিপ্রদাদেবী পরমানন্দদায়িনী।
প্রেমানন্দা পরানন্দা পঙ্কজাক্ষী প্রিয়ংবদা ॥ ৮০ ॥
পূর্ণচন্দ্রাননা পূর্ণা পরমার্থপ্রদায়িনী।
প্রেমাশ্রুগলিতাঙ্গী চ পদ্মাসনা প্রিয়ংকরী ॥ ৮১ ॥
প্রেয়সী প্রণবাকারা পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী
পরাশক্তিঃ পরামুক্তিঃ পূর্ণেন্দুসদৃশাননা ॥ ৮২ ॥
ফলদাত্রী ফলাসক্তা ফণিবেণী বিলাসিনী
ফুল্লেন্দীবরনেত্রা চ ফুল্লহারসুশোভনা ॥ ৮৩ ॥
বরাভয়করাদেবী বরদা বুদ্ধিদায়িনী।
বাণীসিদ্ধা বরানারী বাগ্দেবী ব্রতচারিণী ॥ ৮৪ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুকান্তা বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী।
বিশ্বাশ্রয়া বিশ্বপ্রাণা বিশ্বেশী বিশ্বরূপিণী ॥ ৮৫ ॥
ব্রহ্মরূপা ব্রহ্মময়ী বেদমাতা বরাননা।
বিশ্বাত্মিকা বিশ্ববন্দ্যা বিষ্ণুমন্ত্রস্বরূপিণী ॥ ৮৬ ॥
বিশ্বারাধ্যা বিধাত্রী চ বিশ্বরূপেশ্বরপ্রিয়া।
ব্রহ্মাণ্ডজননীদেবী বেদাঙ্গী বৈষ্ণবী শুভা ॥ ৮৭ ॥
বেদাতীতা বেদগম্যা সর্ববিঘ্নবিনাশিনী।
বেদগুহ্যা বোধগম্যা বীজমন্ত্রস্বরূপিণী ॥ ৮৮ ॥
বৈষ্ণবাগারপালী চ বৈষ্ণবীমাতৃরূপিণী।
বিশ্বরূপভ্রাতৃভার্য্যা বিষ্ণুজায়া পরাৎপরা ॥ ৮৯ ॥
বলদাত্রী বুদ্ধিদাত্রী বিশ্বম্ভরসুবল্লভা।
বিষ্ণুমায়া বিষ্ণুকান্তির্বীজাঙ্কুরা বরেশ্বরী ॥ ৯০ ॥
বিপ্রপত্নী বিশ্বপূজ্যা ব্রাহ্মণী বোধরূপিণী।
ব্রহ্মাদিবন্দিতাদেবী বৈষ্ণবদ্রোহনাশিনী ॥ ৯১ ॥
বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মীর্বরদাত্রী বরপ্রসূঃ।
বিদ্যাবতী বিশ্বকর্ত্রী বিদুষী ব্যাধিনাশিনী ॥ ৯২ ॥
বিষ্ণুসেবারতাদেবী বৈষ্ণবপ্রতিপালিকা।
বংশীবদনসম্পূজ্যা বিশ্বম্ভরপদার্চ্চিকা ॥ ৯৩ ॥
বাঙ্মনস্‌সংযতা বালা বৈষ্ণবপ্রীতিদায়িনী।
বালার্কপ্রতিভাপূর্ণা বৎসলা বিঘ্ননাশিনী ॥ ৯৪ ॥
ব্রজভাবাশ্রিতা বৃন্দা বৃন্দাবনরসাত্মিকা।
ব্রজানন্দপ্রদাদেবী শুদ্ধাভক্তির্ব্রজেশ্বরী ॥ ৯৫ ॥
ভবারাধ্যা ভাগ্যবতী ভবানী ভক্তিদায়িনী।
ভাগীরথী ভক্তিধাত্রী ভবক্লেশ নিবারিণী ॥ ৯৬ ॥

ভক্তিস্বরূপিণীদেবী ভারতী ভক্তবৎসলা।
ভক্তিপ্রসারিণী ভক্তা নবধাভক্তিবর্তিকা ॥ ৯৭ ॥
ভক্তাধিষ্ঠাতৃদেবী চ ভক্তানুগ্রহকারিণী।
ভক্তিজেয়া ভক্তিগম্যা প্রেমভক্তিমহার্ণবা ॥ ৯৮ ॥
ভক্তিব্রজেশ্বরীদেবী ভাবিনী ভবতারিণী।
ভবার্ণবত্রাণকর্ত্রী ভাবুকা ভক্তভাবিনী ॥ ৯৯ ॥
ভক্তানামীশ্বরীদেবী ভক্তগোষ্ঠীশিরোমণিঃ।
ভক্তানাংজীবনপ্রাণা ভক্তমঙ্গলদায়িনী ॥ ১০০ ॥
ভক্তাধীনা ভক্তশ্রেষ্ঠা ভক্তজীবনসম্বলা।
ভক্তানাংপরমারাধ্যা স্বভক্তপ্রতিপালিকা ॥ ১০১ ॥
ভক্তানন্দা ভক্তিরূপা মহাভাগবতী সতী।
ভক্তিমুক্তিপ্রদাদেবী ভাবভক্তিবিনোদিনী ॥ ১০২ ॥
ভক্তভক্তিপ্রিয়া ভদ্রা ভক্তানন্দপ্রদায়িনী।
ভক্তিভাবপ্রদাদেবী ভবতাপপ্রণাশিনী ॥ ১০৩ ॥
ভুবনেশী ভূরিদাত্রী ভূশক্তির্ভূস্বরূপিণী।
ভূপালিকা ভগবতী ভামিনী ভূতপাবনী ॥ ১০৪ ॥
ভূতাত্মিকা ভাবধারা ভক্তগোষ্ঠীশুভঙ্করী।
ভূমাতা ভুবনানন্দা ভক্তদুর্গতিনাশিনী ॥ ১০৫ ॥
ভূভারহারিণীদেবী ভক্তশক্তিস্বরূপিণী।
ভাবমূর্তির্ভূতময়ী ভূমিদা ভবপালিকা ॥ ১০৬ ॥
ভক্তাভীষ্টকরীদেবী ভক্তবাঞ্ছাশুভঙ্করী।
ভূসেবিকা ভ্রান্তিশূন্যা ভূসুরাপত্তিনাশিনী ॥ ১০৭ ॥
মহামায়াসুতাদেবী মোহিনী মতিমোহিনী।
মহালক্ষ্মীর্মহামান্যা সর্বমঙ্গলমঙ্গলা ॥ ১০৮ ॥
মহাশুদ্ধা মহাসিদ্ধা মহামন্ত্রপ্রকাশিকা।
মহাভাবা মহাবিদ্যা মহতাংমতিদায়িনী ॥ ১০৯ ॥
মহামাহেশ্বরী মান্যা মহাশক্তিসমন্বিতা।
মহাপূজ্যা মহাধন্যা মহাশীলা মহাজনা ॥ ১১০ ॥
মহাপুণ্যা মানদাত্রী মায়ামোহবিনাশিনী।
মহাসাধ্বী মহাধীরা মালিনীমতিমোহিনী ॥ ১১১ ॥
মানময়ী মানবতী মানদা মণিমণ্ডিতা।
মাতৃস্বরূপিণী মাতা মঙ্গলা মঙ্গলাস্পদা ॥ ১১২ ॥
মিশ্রকন্যা মহাশান্তা সুমিত্রা মিতভাষিণী।
মুরারিগুরুসম্পূজ্যা মধুকণ্ঠী মধুস্বরা ॥ ১১৩ ॥

মুকুন্দাদিজনারাধ্যা মঞ্জুলা মৃগলোচনা।
মুনিপূজ্যা মূলাধারা মধুস্যন্দা মনোময়ী ॥ ১১৪ ॥
মোক্ষদা মাধবী মুখ্যা মনোজ্ঞা মানধায়িনী।
মহেন্দ্রাদিদেবমান্যা মুকুন্দেমতিদায়িনী ॥ ১১৫ ॥
মন্ত্রদাত্রী মন্ত্রসিদ্ধা মূলমন্ত্রস্বরূপিণী।
মাধুর্যশালিনীশ্রেষ্ঠা মধুরাঙ্গী মনোহরা ॥ ১১৬ ॥
মান্ধাত্রাদিরাজপূজ্যা মহারাত্রির্মহাপ্রভা।
মোহমায়াপরা মুগ্ধা মণিকৌস্তুভভূষণা ॥ ১১৭ ॥
মালাজপপরাদেবী মহিলা মহিমান্বিতা।
মৃণালকোমলভুজা মাতৃশক্তিস্বরূপিণী ॥ ১১৮ ॥
যশস্বিনী যোগসিদ্ধা যোগেশী যজ্ঞসেবিনী।
যশোদাহৃদয়ানন্দা যোগিনী যৌবনান্বিতা ॥ ১১৯ ॥
রামা রত্নময়ী রম্যা নানারত্নবিভূষিতা।
রত্নবেদ্যা অধিষ্ঠাত্রী রত্নালঙ্কারশোভিনী ॥ ১২০ ॥
রসিকা রসময়ীশ্রেষ্ঠা রসজ্ঞা রতিদায়িনী।
রাসেবিলাসিনী রাধা রাসেশী রসদায়িনী ॥ ১২১ ॥
রাসোল্লাসপ্রিয়া রম্ভী রাসলীলাসহায়িকা।
রাধাভাবময়ীরামা রাধিকা রসমঞ্জরী ॥ ১২২ ॥
রাগাত্মিকা রাগময়ী রাগমার্গপ্রদর্শিকা।
রাগানুগা রাসরূপা রাগজ্ঞা রাগরঞ্জিতা ॥ ১২৩ ॥
রাগিণী রূপিণী রস্যা রাগিণীরাগরূপিণী।
রাজরাজেশ্বরী রাজ্ঞী রাজেন্দ্রকুলপূজিতা ॥ ১২৪ ॥
রাধারূপা রসাবেশা রাসলীলাবিনোদিনী।
রূপনামময়ী রূপ্যা রৌরবত্রাণকারিণী ॥ ১২৫ ॥
রামানন্দরায়বন্ধ্যা রামাণাংমতিমোহিনী।
রাসমণ্ডলমধ্যস্থা রাসোৎসববিহারিণী ॥ ১২৬ ॥
রাকাচন্দ্রপ্রভা রাকা রমণী রমণীপ্রিয়া।
রাজ্যলক্ষ্মী রাজ্যদাত্রী রাজপূজ্যা রসেশ্বরী ॥ ১২৭ ॥
লক্ষ্মীপ্রিয়াসপত্নী চ ললনাকুলপালিনী।
লক্ষ্মীস্বরূপিণীদেবী ললিতা লোকপালিনী ॥ ১২৮ ॥
লাবণ্যাম্ভোধিরূপা চ লজ্জাশীলা লসত্তনুঃ।
লাস্যা বিদ্যুল্লতাগোরী লজ্জারূপা কুলাঙ্গনা ॥ ১২৯ ॥
লীলাবতী লাস্যরক্তা লীলাপ্রীতা কলাবতী।
লীলামধুদানকর্ত্রী লীলালুব্ধা লতাতনুঃ ॥ ১৩০ ॥

লোকমাতা লোকপূজ্যা লীলাগানপরায়ণা।
লোকলাল্যা লোককর্ত্রী লৌকিকী লয়কারিণী॥ ১৩১॥
লোকানুগ্রহকর্ত্রী চ লীলালাবণ্যশালিনী।
লোকলয়া লোকমান্যা কলিক্লেশনিবারিণী॥ ১৩২॥
লোকেশ্বরী লোকবন্দ্যা ত্রৈলোক্যপ্রতিপালিনী।
লৌকিকাচারকর্ত্রী চ লোকালোকা লবপ্রিয়া॥ ১৩৩॥
শব্দাতীতা শব্দরূপা শমাদিগুণভূষিতা।
শক্তিসংচারিণীদেবী শংকরী চ শুভংকরী॥ ১৩৪॥
শালগ্রামপ্রিয়াদেবী শচীসুতবিলাসিনী।
শান্তিরূপা শান্তিদাত্রী শঙ্খকঙ্কণধারিণী॥ ১৩৫॥
শান্তিসংস্থাপিকাদেবী শাক্তশক্তিস্বরূপিণী।
শ্যামসৌভাগ্যবলিতা শুভদা শক্তিদায়িনী॥ ১৩৬॥
শিরঃস্থা শীর্ষমধ্যস্থা শ্রীরূপা শ্যামমোহিনী।
শীতলা শীতলানন্দা শ্রীসীতাচিত্তমোহিনী॥ ১৩৭॥
শোভাময়ী শোভমানা শিবদা শুভশালিনী।
শোকদুঃখহরাদেবী শোকমুক্তা শুভাশ্রয়া॥ ১৩৮॥
শ্রদ্ধাদাত্রী শুদ্ধসুখা শুদ্ধভক্তিপ্রদায়িনী।
শ্রদ্ধা সুধা মহাশুদ্ধা সাত্ত্বিকী ব্রতচারিণী॥ ১৩৯॥
শ্রুতিস্মৃতীনাং মর্ম্মজ্ঞা শরণাগতপালিকা।
শাস্ত্রশ্রবণসম্প্রীতা শাস্ত্রমর্মপ্রচারিণী॥ ১৪০॥
শ্রীদ্যুতিঃ শ্রীমতী সাধ্বী শ্রীগৌরাঙ্গোরসিস্থিতা।
শ্রীবৈষ্ণবপ্রিয়াদেবী স্ত্রীলোকানাং শিরোমণিঃ॥ ১৪১॥
সদানন্দময়ীদেবী সর্বসিদ্ধিসমন্বিতা।
সর্বার্থসাধিকা সত্যা সর্বদাসৎপ্রচারিণী॥ ১৪২॥
সংকীর্ত্তনরসানন্দা সচ্ছাস্ত্রপরিপাঠিকা।
সখীমণ্ডলমধ্যস্থা সত্যরূপা সনাতনী॥ ১৪৩॥
সদাগৌররসেমগ্না সর্বদাপতিভাবিনী।
সর্বলোকপূজ্যতমা সদাগৌরকুতূহলা॥ ১৪৪॥
সদাহাস্যময়ীদেবী সর্বশক্তিসমান্বিতা।
সরস্বতীপতের্ভার্যা সর্ববিদ্যাপ্রদায়িনী॥ ১৪৫॥
সংখ্যানামজপেমগ্না সংখ্যানামজপেরতা।
সংসারকর্ত্রী সংসিদ্ধা সর্বমঙ্গলদায়িনী॥ ১৪৬॥
সর্বশ্রেষ্ঠগুণময়ী সর্বদাভাবহারিকা।
সংসারোদধিতরণী সদাসৎসঙ্গসেবিনী॥ ১৪৭॥

সর্বজ্ঞা সর্বকল্যাণী সর্বভূতদয়াবতী।
সর্বশ্রেষ্ঠা সর্বপূজ্যা সর্বসম্পদ্‌বিধায়িনী ॥ ১৪৮ ॥
স্বর্গাপবর্গদাদেবী সর্বকামফলপ্রদা।
স্বয়ংসিদ্ধা স্বতন্ত্রা চ স্বাহা স্বেচ্ছাময়ী স্বধা ॥ ১৪৯ ॥
সান্দ্রানন্দা সুবর্ণা চ সাবিত্রী স্বপরা সতী।
সৌভাগ্যসহিতা সালিঃ সালংকারা সুভাষিণী ॥ ১৫০ ॥
স্বামিভক্তেঃশিক্ষয়িত্রী স্বামিসেবাপরায়ণা।
স্বকামিনী সুলাবণ্যা স্বনামগায়কপ্রিয়া ॥ ১৫১ ॥
সুন্দরী সুমতেদাত্রী সুশীলা সুগতিপ্রদা।
সুরেশ্বরী সুরৈর্বন্দ্যা সুচারা সুরুচিপ্রিয়া ॥ ১৫২ ॥
সুরাসুরগণৈঃপূজ্যা সত্যসারা সত্যংগতি।
সুকুমারী সুন্দরাঙ্গী সুকেশী সুভগাশয়া ॥ ১৫৩ ॥
সুধাময়ী সৌখ্যদাত্রী সুখশান্তিবিধায়িনী।
সুবর্ণবর্ণাভাদেবী সুন্দরীকুলমঞ্জরী ॥ ১৫৪ ॥
সুচারুকবরীযুক্তা সর্বদা-নবযৌবনা।
সুনায়িকা সুশোভাঢ্যা সুভঙ্গী সুন্দরপ্রভা ॥ ১৫৫ ॥
সর্বধর্মময়ীদেবী সর্বাপত্তিবিনাশিনী।
সর্বান্তর্যামিনী সাধ্যা সর্বদামধুভাষিণী ॥ ১৫৬ ॥
সর্বভক্তপ্রমোদা চ সর্ববৈষ্ণবসেবিতা।
সর্বাপত্তারিণীদেবী সর্ববিঘ্নবিনাশিনী ॥ ১৫৭ ॥
সর্বেশ্বরী সর্বশ্রুতা সর্বগা সর্বমঙ্গলা।
সর্বাধারা সর্বপরা সর্বমাধুর্যশালিনী ॥ ১৫৮ ॥
সর্বেন্দ্রিয়েশ্বরী সৌম্যা সাধিকানাংশিরোমণিঃ।
সর্বসত্ত্বগুণোপেতা সর্বসাধনতৎপরা ॥ ১৫৯ ॥
সর্বস্বরূপা সর্বাঢ্যা সর্বযোগসমন্বিতা।
সত্ত্বরূপা সর্বগুণা সুদতী সুষ্ঠুবেশিনী ॥ ১৬০ ॥
সৌভাগ্যদায়িনীদেবী সীমন্তিনী সদাব্রতা।
সৌরভ্যপরিপূর্ণাঙ্গী সুমুখী সৌরভপ্রিয়া ॥ ১৬১ ॥
ষোড়শী ষড়্‌ভুজপ্রেষ্ঠা ষড়্‌রাগময়রূপিণী।
ষড়্‌দর্শনপরিজ্ঞাত্রী ষষ্ঠী ষন্মুখবল্লভা ॥ ১৬২ ॥
হর্যঙ্‌ঘ্রিপদ্মশরণা হরিপ্রেষ্ঠা হরিপ্রিয়া।
হরিপাদাব্জমধুপা হরিসেবাপরায়ণা ॥ ১৬৩ ॥
হরিণ্যাক্ষী হরের্দাসী হরিনামপ্রচারিণী।
হরিবক্ষোবিহারা চ হংসিনী হরিসেবিকা ॥ ১৬৪ ॥

হরিচিত্তহরাদেবী হ্লাদিনী হিতকারিণী।
হিতবাগ্ হিতকামা চ হিংসাদ্বেষনিবারিণী ॥ ১৬৫ ॥
হাস্যাননা হরারাধ্যা হেমহারসুশোভিনী।
হা নাথ! নাথ হা! শব্দৈবিলপন্তী মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৬৬ ॥
হারহীরা হেমবস্ত্রা হাসিনী হ্লাদরূপিণী।
হার্দজ্ঞা হলিনী হৃদ্যা হেমাঙ্গহৃদয়েশ্বরী ॥ ১৬৭ ॥
হোমযজ্ঞেশ্বরীদেবী মহামায়া মহোদয়া।
হারিতাদিমুনীড্যা চ হাহাকারনিবারিণী ॥ ১৬৮ ॥
হেমাঙ্গদা হেমসূত্রা হেমকুণ্ডলভূষণা।
হরিতালাভবর্ণা চ হেমচন্দ্রনিভাননা ॥ ১৬৯ ॥
হেমাম্বুজবদনীদেবী হ্রীমতী হ্রীস্বরূপিণী।
হ্রীংবীজময়রূপা চ হৃদয়ানন্দদায়িনী ॥ ১৭০ ॥
ক্ষমামূর্তিমতীদেবী ক্ষমাইধারা ক্ষমাপ্রিয়া।
ক্ষমাতুল্যা ক্ষমাদাত্রী ক্ষমাধারা ক্ষমামতিঃ ॥ ১৭১ ॥
ক্ষেমদাত্রী ক্ষেমময়ী অক্ষমেক্ষান্তিবর্ষিণী।
ক্ষৌমপ্রিয়া ক্ষিতিস্রষ্ট্রী ক্ষেত্রজ্ঞা ক্ষেত্ররূপিণী ॥ ১৭২ ॥
ক্ষেমংকরী ক্ষেমশক্তিঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞভাবিনী।
ক্ষীরোদবাসিনীদেবী ক্ষিতৌ ভিক্ষাপ্রদায়িনী ॥ ১৭৩ ॥
ক্ষীণাঙ্গী ক্ষীণমধ্যা চ ক্ষিতিদেবপ্রপূজিতা।
ক্ষৌমবাসঃপরীধানা অক্ষয়স্বর্গদায়িনী ॥ ১৭৪ ॥
নবদ্বীপাস্রিতাদেবী নিত্যনূতনভক্তিদা।
বিষ্ণুভক্তপ্রিয়াবামা সর্বাপৎসুশুভংকরী ॥ ১৭৫ ॥
নবদ্বীপধরাদেবী নবদ্বীপপ্রদীপিকা।
নবদ্বীপপরিত্রাত্রী নবধাভক্তিদায়িকা ॥ ১৭৬ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়ায়া নামানি পঠেদ্বা শৃণুয়াদপি।
গৌরভক্তির্ভবেৎতস্য ভবেদ্ গৌরকৃপা ধ্রুবম্ ॥ ১৭৭ ॥
সহস্রনামান্যেতানি যঃ পঠেদ্ ভক্তিপূর্বকম্।
অন্তকালে ভবেত্তস্য শ্রীগৌরাঙ্গে মতিঃস্মৃতিঃ ॥ ১৭৮ ॥

ইতি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহস্রনাম স্তোত্রম্ সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াষ্টকম্

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর নামে একটি 'অষ্টক' পাওয়া যায়। তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

গৌরাকৃতের্ভগবতো মহিমার্ণবস্য
শ্রীপ্রেমভক্তিরসদানবিধৌ বিভাব্যা।
সাচিব্যশক্তিঘনমূর্তিরিবেহ ভক্তি-
র্বিষ্ণুপ্রিয়া বিজয়তাং জগতাং জয়শ্রীঃ ॥ ১ ॥

মহিমার অগাধ সাগর ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রেম-ভক্তি-রস-বিতরণের কার্য্যে সহযোগ প্রদানের জন্য তাঁহারই শক্তির মূর্ত্তপ্রকাশ বিগ্রহ চতুর্দ্দশ ভুবনের বিজয়লক্ষ্মীরূপা ভক্তিস্বরূপিণী ভগবতী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সদা বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন। ॥ ১ ॥

মায়াপুরেন্দুমহিষী মহিমোজ্জ্বলশ্রী-
রভ্যর্চ্যচারুচরণামরমুখ্যবৃন্দৈঃ।
যা প্রেমভক্তিরসদা শুভদা নতানাং
বিষ্ণুপ্রিয়া বিজয়তাং জগতাং জয়শ্রীঃ ॥ ২ ॥

শ্রীমায়াপুরের চন্দ্রমারূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মহারাণী ভগবতী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সদা সর্বোপরি জয়যুক্তা হউন; যাঁহার চারুচরণ শ্রেষ্ঠ দেবতাগণের অর্চ্চনীয় এবং যিনি (অধিকারিদের) প্রেমভক্তির রসপান করান, প্রণতদের শুভফল প্রদান করেন; সকল লোকের বিজয়লক্ষ্মীরূপা; নিজের (অলৌকিক) মহিমা হইতে প্রকাশিত শোভাকে ধারণ করেন। ॥ ২ ॥

দেবী শুভাশয়সনাতনমিশ্রপুত্রী
শ্রীপাদসেবনরতানতদুঃখহন্ত্রী।
কান্তাবরা দ্বিজপুরন্দরনন্দনস্য
বিষ্ণুপ্রিয়া বিজয়তাং জয়শ্রীঃ ॥ ৩ ॥

যাঁহার চরণসেবায় নিযুক্তজনের অশেষ দুঃখ নাশ হয়; সদাশয় শ্রীসনাতন মিশ্রের আত্মজা এবং ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আত্মজ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কান্তাশ্রেষ্ঠা, সর্ব্বলোকের বিজয়লক্ষ্মীরূপা ভগবতী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সদা জয়যুক্তা হউন ॥ ৩ ॥

বৈকুণ্ঠনাথদয়িতাবিততীবিমৃগ্যৈঃ
সৌন্দর্যসৌভগগুণৈরনুবশ্যকান্তা।
বৃন্দারকেন্দ্রললনাকুলজুষ্টকীর্তি-
র্বিষ্ণুপ্রিয়া বিজয়তাং জগতাং জয়শ্রীঃ ॥ ৪ ॥

বৈকুণ্ঠাধিপতি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রেয়সীগণ (ভগবতীলক্ষ্মী, ভূদেবী-আদি) ও যাঁহার নিকট করজোড়ে অনুগ্রহপ্রার্থী (কিন্তু পান না), সৌন্দর্য্য এবং অনুপমগুণের দ্বারা যিনি নিজ প্রিয়তম প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে আপন বশে রাখিয়াছেন এবং যাঁহার কীর্ত্তি শ্রেষ্ঠ দেবতাদের ললনাগণ ও সর্ব্বদা কীর্ত্তন করেন, বিশ্বের বিজয়লক্ষ্মীরূপা সেই ভগবতী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সদা জয়যুক্তা হউন। ॥ ৪॥

কারুণ্যসৌরভসুবাসিতসর্ববিশ্বা
লাবণ্যবীচিপরিদিগ্ধদিগন্তরা যা।
শ্রীমচ্ছচীহৃদয়নন্দননন্দয়িত্রী
বিষ্ণুপ্রিয়া বিজয়তাং জগতাং জয়শ্রীঃ ॥ ৫ ॥

যাঁহার করুণারূপ সুগন্ধদ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৌরভিত, লাবণ্যরূপ সমুদ্রতরঙ্গ সমগ্র বিশ্বব্যাপ্ত, যিনি পরমসৌভাগ্যশালিনী শ্রীশচীমাতার হৃদয়-নন্দন ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেবেরও আনন্দবিধানকারিণী, এবং সমস্ত ভুবনের বিজয়লক্ষ্মীরূপা সেই ভগবতী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী জয়যুক্তা হউন ॥ ৫ ॥

যা শ্রীশচীসুতকটাক্ষশরার্দ্দিতাপি
লীলোচ্ছলন্মদনকার্ম্মুকসংনিভভ্রূঃ।
জেত্রীব বর্ম্ম বিপুলং পুলকং বহন্তী
বিষ্ণুপ্রিয়া বিজয়তাং জগতাং জয়শ্রীঃ ॥ ৬ ॥

ভগবান শ্রীশচীনন্দনের কটাক্ষবাণে পীড়িত হলেও বিলাসপূর্ব্বক আনন্দে নিজ ভ্রূকুটিরূপ কন্দর্পশরাসনের প্রভাবে যিনি তাঁহাতে অনায়াসে স্মরণরূপ সমরে পরাজিত করেন এবং সঘন পুলকাবলীরূপ কবচ ধারণ করে থাকেন; সমস্ত ভুবনের লক্ষ্মীরূপা সেই ভগবতী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী জয়যুক্তা হউন ॥ ৬ ॥

যানঙ্গতপ্তনিজকান্তকরীন্দ্রসঙ্গা-
দারব্ধতুঙ্গরসসংগররঙ্গনেত্রী।
কন্দর্পকোটিজয়িগৌরমনোহভিরামা
বিষ্ণুপ্রিয়া বিজয়তাং জগতাং জয়শ্রীঃ ॥ ৭ ॥

অনঙ্গবাণে পীড়িত গজেন্দ্রসদৃশ নিজ প্রিয়তমের সহিত প্রস্তুত প্রকৃষ্ট রসময় সংগ্রামরঙ্গস্থলের নেতৃত্বকারিণী; করোড়ী কামদেবকেও পরাজিত-কারিণী; শ্রীগৌরচন্দ্রেরও চিত্তমোহিনী, ত্রিভুবনের বিজয়লক্ষ্মীরূপা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সর্ব্বদা জয়যুক্তা হউন ॥ ৭ ॥

প্রেমামৃতাব্ধিকনকাঙ্গহরে রসজ্ঞা
যা সর্বকামবরদা হৃদয়াধিদেবী।
কেলীকলাসুকুশলা সুখদা সখীনাং
বিষ্ণুপ্রিয়া বিজয়তাং জগতাং জয়শ্রীঃ ॥ ॥ ৮ ॥

যিনি শ্রীগৌরহরির প্রেমরসেরই কেবল মর্ম্মজ্ঞা নহেন পরন্তু তাঁহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবী ; সম্পূর্ণ অভীষ্ট বরদাত্রী ; কেলীকলাতে সুচতুরা, সখীদের আনন্দদানকারিণী, ত্রিলোকের বিজয়লক্ষ্মীরূপা সেই ভগবতী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী সদা জয়যুক্তা হউন। ॥ ৮ ॥

কেনচিদ্ গৌরদাসেন রাধিকাবনসেবিনা।
নবদ্বীপং সমাশ্রিত্য লিখিতং পদ্যমষ্টকম্ ॥ ৯ ॥

বৃন্দাবননিবাসী কোন এক গৌরভক্ত নবদ্বীপের শরণ লইয়া উপরোক্ত অষ্টশ্লোক বচনা করিয়াছেন। ॥ ৯ ॥

যঃ পঠেচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং শ্রদ্ধয়া পরয়া মুদা।
বিন্দেদ্ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীপদদাসমসংশয়ম্ ॥ ১০ ॥

যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পরমযত্নের সহিত উপরোক্ত অষ্টক নিত্য পাঠ এবং শ্রবণ করিবে তাহার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর চরণ সেবা নিঃসন্দেহে লাভ হইবে। ॥ ১০ ॥

● 'বিষ্ণুপ্রিয়া সহস্রনাম স্তোত্রম' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

মহাতপস্বিনী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্ম কুণ্ডলী

বৈষ্ণব গ্রন্থ রচয়িতাদের মতানুসারে চৈতন্যজায়া বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্ম হয় ৯০০ বঙ্গাব্দে, মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথির পুণ্যলগ্নে (ইং ১৪৯৪ খ্রীঃ)। তাঁর জন্মের প্রথম শুভক্ষণে গঙ্গাবিধৌত নবদ্বীপের আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল বাগ্‌দেবী সরস্বতী পূজার বৈদিক মন্ত্র এবং মাঙ্গলিক শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি। বৈষ্ণব গ্রন্থাদির বর্ণনা অনুযায়ী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর জন্ম সময় সম্পর্কে এরকম একটা ধারণা আমরা পাই। অধ্যাপক ড: সুখময় মুখোপাধ্যায় চৈতন্যদেবের জীবনপঞ্জীতে উল্লেখ করেছেন, ১৪৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে নিমাইয়ের ৮ বছর বয়সে উপনয়ন হয়েছিল অর্থাৎ সময়টি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মের মাত্র তিন মাস পর। ঐ সালের বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া তিথি যদি ১৮ এপ্রিল হয় তবে তিথি গণনা অনুসারে মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিটি ২০ জানুয়ারি হওয়া উচিৎ। সুতরাং ধরা যায় বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্ম হয়েছিল ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারি সকালবেলায়।

চৈতন্যদেবের প্রচলিত জন্ম কুণ্ডলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে জন্ম-তারিখ ও সময় অনুযায়ী সাধিকা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সম্ভাব্য রাশিচক্র নিরূপণ করলে দেখা যাচ্ছে তাঁর কুম্ভরাশি, কুম্ভলগ্ন ও পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের প্রারম্ভিক পর্যায়ে জন্ম। 'বিষ্ণুপ্রিয়া : জীবন ও সাধনা' পর্বে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর

জীবনীর যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, রাশিচক্রে গ্রহ সন্নিবেশ বিশ্লেষণ করলে তার আনুপূর্বিক মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনুমানিক বিংশোত্তরী দশাকালের সঙ্গে চৈতন্যদেবের জীবনপঞ্জীর সামঞ্জস্যও স্থাপিত হয়েছে।

'চারযুগে হৈলাম আমি গো জনম দুখিনি'—শ্রীরাধার এই চিরন্তন আক্ষেপের সুর যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছিল মহাবৈষ্ণবী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কণ্ঠেও। 'শ্রীরাধার অংশেই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্ম বলা হয়ে থাকে। বিরহের আগুনে পুড়িয়ে মনুষ্যদেহে অতিপ্রাকৃত শক্তির আধার হিসেবে তাঁকে তৈরি করার জন্যই বোধহয় বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর রাশিচক্রে সপ্তমপতি রবি দ্বাদশস্থানে তুঙ্গী মঙ্গল যুক্ত হয়ে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বামী তো যুগাবতার চৈতন্যদেব। তাই পতিস্থানে বসেছিলেন স্বয়ং দেবগুরু বৃহস্পতি এবং তাঁকে দৃষ্টি দিয়ে আরতি করছিলেন দৈত্যগুরু শুক্র, গ্রহরাজ শনি এবং চন্দ্র মঙ্গল ও বুধ।- রাশি ও লগ্নের একাদশে বলবান বৃহস্পতির দৃষ্টি থাকায় বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী জন্মেছিলেন ধনী রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের গৃহে। সপ্তমস্থ গ্রহের দশাতেই তাঁর জন্ম। তাই আবির্ভাবক্ষণেই পিতামাতা তাঁকে ভগবান বিষ্ণুর পাদপদ্মে সমর্পণ করেন। গোলোক ও বৈকুণ্ঠে যিনি প্রকৃতই 'বিষ্ণুপ্রিয়া,' মর্তধামে তিনিই আবির্ভূতা হলেন 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নামে। বৈষ্ণবাচার্যগণ বলেন 'বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী হলেন মহাপ্রভুর মুখ নিঃসৃত বাণী।' সেকারণেই বোধহয় শুধু সরস্বতী পূজার দিনই তাঁর জন্ম হয়নি, জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী সরস্বতী যোগেও তাঁর জন্ম। রাশি ও লগ্নের কেন্দ্রে বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্রের অবস্থান হেতু এই যোগের সৃষ্টি হয়েছে।

কৈশোরে পদার্পণের প্রাক্কালেই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল মানুষের মুখে মুখে। কিন্তু তনুভাবে যাঁর বলবান শুক্র-চন্দ্র-বুধ ও বৃহস্পতির প্রভাব, তাঁর রূপ বর্ণনা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত। 'চৈতন্য-মঙ্গলে' লোচনদাস তাঁর কাব্যশক্তি উজাড় করে কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

> বক্ষঃস্থল পরিসর সুমেরু জিনিয়া।
> কেশরী জিনিয়া মাঝা অতি সে ক্ষীণিয়া ॥
> কামদেব রথচক্র জিনিয়া নিতম্ব।
> ঊরুযুগ জিনি রাম কদলক স্তম্ভ ॥ ৪৮৩ ॥

এ বর্ণনা শুনে মনে হয় বৃহস্পতি ও চন্দ্রের প্রভাবই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর তনুভাবে অধিক প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এবারে দেখি জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদ-গণ কি বলেন? দেহভাবে বলবান বৃহস্পতির প্রভাব আলোচনা কালে তাঁরা বলেছেন—

সুন্দর ঃ সুন্দরকর ঃ সুকুচো রোগবর্জ্জিতঃ।
সুঞ্জঃ সুভূষঃ সম্বস্ত্রঃ সুনাভি কটি সংযুতঃ ॥ ২৪৫ ॥
(জ্যোতিষ কল্পবৃক্ষ—শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য)

বুধ প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন—'সুমূর্ত্তির্নিপুণঃ শান্তো মেধাবী চ প্রিয়ম্বদঃ।' বিবাহোত্তরকালে পট্টবস্ত্র পরিহিতা সালংকারা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অবয়ব ও আচরণে প্রাজ্ঞ জ্যোতিষিবর্গের মন্তব্যের প্রতিফলনই আমরা বৈষ্ণব পদকর্তাদের বর্ণনায় প্রত্যক্ষ করি।

দ্বাদশবর্ষে পদার্পণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিবাহ হয়। বিংশোত্তরী দশা অনুযায়ী তখন বৃহস্পতির দশা মঙ্গলের অন্তর্দশা চলছিল। সপ্তমস্থ বৃহস্পতির উপর মঙ্গলের দৃষ্টি থাকায় এই দশান্তর্দশাতেই তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু তারপরেই শুরু হয় বৃহস্পতি ও রাহুর দশান্তর্দশা। রূপে-গুণে অতুলনীয়, স্বামী গর্বে চিত্ত ঝলমল করলেও তাঁর যৌবন সরসীর নীরে মিলনের শতদল প্রস্ফুটিত হ'ল না। ষোড়শী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে ঘুমন্ত অবস্থায় ফেলে রেখে, 'শ্যাম বিষে আচ্ছন্ন' নিমাই পণ্ডিত গৃহত্যাগ করলেন ৯১৬ বঙ্গাব্দের ২৭ শে মাঘ শেষ রাত্রে (ইং ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ)। তার অনেক আগেই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর শনির দশান্তর্দশা কাল শুরু হয়ে গেছে। এবার আরম্ভ হ'ল তাঁর সাধিকা জীবনের সূচনা। মূল ত্রিকোণগত লগ্নপতি শনির প্রখর তেজে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর চেতনায় সঞ্চারিত হ'ল আদ্যাশক্তি। এই শক্তির অদৃশ্য প্রভাবে সন্ন্যাসোত্তর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বৃন্দাবনে যাওয়ার তাৎক্ষণিক প্রয়াস ব্যর্থ হ'ল। শনি, বুধ ও বৃহস্পতির প্রভাবে তিনি পেয়েছিলেন পূর্বানুমান ক্ষমতা। গৌরাঙ্গদেবের গৃহত্যাগের প্রাক্কালেই তিনি আসন্ন বিচ্ছেদের পূর্বাভাষ ব্যক্ত করেছিলেন শচীমাতা ও তাঁর অন্তরঙ্গ সখীর কাছে। পরবর্তীকালেও নানা ঘটনায় তাঁর এই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কুম্ভরাশির যোগকারক গ্রহ শুক্র লগ্নস্থ হওয়ায় নানাভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর শিল্পীসত্তার উম্মোচন ঘটেছিল। তিনি পটে অঙ্কন, রন্ধন এবং কীর্তনগানে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি ছিলেন সুগৃহিণী। শুক্র চতুর্থ স্থানের অধিপতি হওয়ায় বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী আটজন মূল সখী সহ বাহাত্তর জন সখী দ্বারা সদা পরিবৃতা থাকতেন। এদের সাহায্যেই তিনি পারিবারিক কীর্তনের প্রচলন করেন। গুরুসৌরি যোগের শুভ প্রভাবে তিনি গৃহভ্যন্তরে থেকেও নেতৃত্ব দেওয়ার শক্তি অর্জন করেন। তাই অদ্বৈত পত্নী সীতাদেবীর পরই দ্বিতীয় বৈষ্ণব আচার্যার আসন তিনি অলংকৃত করেছিলেন, ভাগ্যপতি শুক্রের আনকুল্যেই বোধ হয় শনি ও শুক্রের দশান্তর্দশায়। ৯২২ বঙ্গাব্দের (১৫১৬ খৃীষ্টাব্দ) ফাল্গুনের শেষে নবদ্বীপে

চৈতন্যদেবের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তাঁর তপস্যার দীপ্তির কাছে যেন মুহূর্তের জন্য ম্লান হয়ে যায় চৈতন্যদেবের ভক্তিপ্রেমরসে আচ্ছাদিত শক্তি। স্বল্প বাক্ বিনিময়ের পরে তিনি স্বামীর পাদুকা গ্রহণ করেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ভুবনমোহিনীরূপে চৈতন্যদেব মোহাচ্ছন্ন না হলেও হয়তো বা তৎকালীন অপশাসনের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি নিজ সেবা কার্য থেকে ছাড়িয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে সর্বদা নজরে রাখার জন্য দামোদর পণ্ডিতকে পাঠিয়ে দেন নবদ্বীপে। এভাবে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী প্রায় নিজগৃহে অন্তরীণ ছিলেন। দ্বাদশস্থ রবি ও মঙ্গলের উপর রাহুর দৃষ্টির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা মনুষ্যদেহে সম্ভব হয়নি।

গবেষকদের মতানুযায়ী, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুন (৯৩৯ বঙ্গাব্দের ৩১শে আষাঢ়) চৈতন্যদেবের তিরোধান হয়। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মকুণ্ডলী অনুযায়ী তখন তাঁর অষ্টমপতি বুধের ও দুঃস্থানগত সপ্তমপতি রবির দশান্তর্দশা চলছে। এর পরেই শুরু হয় তপস্বিনী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রকৃত কৃচ্ছ্রসাধন। তাঁর রাশিচক্রে বলবান ধর্মপতি কেন্দ্রস্থ এবং বলবান লগ্নপতি লগ্নস্থ। এ দুইয়ের সমন্বয়ে তপস্বী যোগের সৃষ্টি হয়েছে। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর তপঃশক্তির জ্যোতি বিচ্ছুরিত হ'ল দিগন্তে এবং পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর অসংখ্য ঊর্মিমালায়। প্রায় অনাহারে থেকে জীবন ধারণ করার অলৌকিক শক্তি অর্জন করেছিলেন তিনি। শাশুড়ীর সেবাকার্যের মধ্যে তাঁর সংসারী মন যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, শচীমাতার তিরোধানের পর তা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়। লগ্নে চারটি গ্রহের অবস্থান হেতু তাঁর রাশিচক্রে প্রব্রজ্যা যোগ থাকলেও তিনি গৃহত্যাগ করেননি লগ্নস্থ শুক্রের প্রভাবেই। জীবযোগ ও শঙ্খযোগের আনুকূল্যে গৃহে থেকেই সম্পূর্ণ মৌলিক পদ্ধতি অনুসরণ করে ধর্মাচরণ ও তপস্যা করেছেন। চল্লিশোর্ধ্ব জীবনে তনুভাবস্থ শনির প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রৌঢ়ত্বের প্রাঙ্গণে তাঁর দেহ 'কৃষ্ণা চতুর্দশীর চাঁদের মতো' ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়েছিল। কিন্তু তিনি বেঁচেছিলেন দীর্ঘকাল। জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদগণের মতে—

> বুধো বা ভার্গবো বাপি গুরুর্বাকেন্দ্র সংস্থিতঃ।
> শতায়ুর্বলবান বিত্তো জাতো গোত্রাধিপো ভবেৎ ॥
>
> (জ্যোতিষ কল্পবৃক্ষ—শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য)

এ কারণেই তিনি স্থিতপ্রজ্ঞা, গোত্রশ্রেষ্ঠা ও দীর্ঘজীবী হন এবং প্রায় শতাব্দীকালব্যাপী গৌরাঙ্গ সাধনায় অত্মমগ্ন থাকেন।

জ্যোতিষীবিচারে ৯৯৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুণ মাসের দোল পূর্ণিমায় মহাপ্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করে মহাসাধিকা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ব্রাহ্মমুহূর্তে সমাধিস্থ হন এবং ইহধাম ত্যাগ করেন। ষষ্ঠপতি চন্দ্র সেদিন তাঁর লগ্নের সপ্তমে বা পতিস্থানে

অবস্থান করছেন। তখন তাঁর মঙ্গলের দশা ও রাহুর অন্তর্দশার প্রায় শেষপর্ব সমাগত। জন্মকুণ্ডলীতে কর্মাধিপতি মঙ্গল তুঙ্গী হয়ে বসে আছেন। তাঁর মোক্ষস্থানে এবং মৃত্যুস্থানে অবস্থিত রাহু দৃষ্টি দিচ্ছেন তাঁকে। বৈকুণ্ঠে ফিরে যাওয়ার এই তো মহালগ্ন। কিন্তু যুগাবতার স্বামীর আত্মায় লীন হওয়ার ঐকান্তিক বাসনায় তিনি এই দিনে ইহধাম ত্যাগ করলেন, নাকি এটা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর এক নীরব প্রতিবাদ ? কারণ দোল পূর্ণিমার পুণ্যদিনেই তাঁর স্বামী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কি এই ইচ্ছা ছিল ধরা ধামে অগণিত ভক্তজন চৈতন্যদেবের আবির্ভাব তিথি পালন করার সময় মুহূর্তের জন্য হলেও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর তিরোধানের কথা স্মরণ করে বিষণ্ণ হবেন ?

বিষ্ণুপ্রিয়া বংশলতা

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পিতামহ ছিলেন দুর্গাদাস মিশ্র। দুর্গাদাস মিশ্রের দুই পুত্র। সনাতন মিশ্র ও পরাশর কালিদাস। সনাতন মিশ্রের আবার দুই সন্তান। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও যাদব আচার্য।

দুর্গাদাস মিশ্র সর্ব গুণের আকর।
বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস নদীয়া নগর।।
তাঁহার পত্নীর হয় শ্রীবিজয়া নাম।
প্রসবিলা দুই পুত্র অতি গুণধাম।
জ্যেষ্ঠ সনাতন কনিষ্ঠ পরাশর কালিদাস
পরম পণ্ডিত সর্বগুণের আবাস।।

(প্রেমবিলাস – নিত্যানন্দ দাস, ঊনবিংশ বিলাস)

চৈতন্যতত্ত্ব-দীপিকা অনুসারে জানা যায়, সনাতন মিশ্র ছিলেন যজুর্বেদীয় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাঁর পূর্বপুরুষগণ মিথিলার অধিবাসী ছিলেন।

শ্রীসনাতন মিশ্রস্য বংশং বক্ষ্যে বিধানতঃ।
পবিত্র কীর্তনং ধন্যং যতশ্রুত্বা নির্মলীভবেৎ।।
পুত্রঃ শ্রীযাদবাচার্য্যঃ কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াস্য চ।
যামুপায়ংস্তু বিধিবৎ শ্রীশচীনন্দনো হরিঃ।
তদ্‌ভ্রাতৃতনয়ঃ শ্রীমম্মাধবাচার্য্য ঈরিতঃ।।

[শশীভূষণ গোস্বামী ভাগবতরত্ন]

'ধামেশ্বর মহাপ্রভু' ও 'ধামেশ্বরী বিষ্ণুপ্রিয়া'র সেবাধিকারী 'বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবারের' বংশলতা নিম্নে বর্ণিত হল। এই গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা-পূজাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে প্রায় পঞ্চশতবর্ষের বৃহ একান্নবর্তী পরিবার। ভারতীয় মঠ মন্দিরের ইতিহাস অবলোকন করলে এই বৃহৎ পরিবারের মত দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া দুরূহ। যদিও এই পরিবারের কিছু কৃতি সদস্য বাসস্থান ও উপার্জন সূত্রে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত থাকার ফলে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছে। তবে নির্দিষ্ট সময় তালিকা অনুযায়ী যার যখন সেবা পূজার অধিকার থাকে, ভক্তিনত চিত্তে অবশ্য

কর্তব্য হিসেবে তারা সে দায়িত্ব পালন করে। অবশ্য অনেকের সেবা-পুজার অধিকার চাকুরীর জন্য ও বণ্টনযোগ্য না হওয়ায় অন্যান্য উত্তরাধিকারীর কাছে বিক্রী করেও দিয়েছে।

মাধব আচার্যর তিরোধানের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ষষ্ঠীদাস গোস্বামী বিগ্রহের পুজার অধিকারী হয়। ষষ্ঠীদাসের পর তার দুই পুত্র রামদেব ও মহাদেব এবং তার সন্তানগণের দ্বারা নবদ্বীপে 'ধামেশ্বর মহাপ্রভু' ও 'ধামেশ্বরী বিষ্ণুপ্রিয়া' দেবীর সেবা পুজা ও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান সুশৃঙ্খল ভাবে পালিত হয়ে আসছে। সুবিস্তৃত বংশলতার ধারাবাহিক ক্রমবিন্যাস করা হয়েছে 'দশ আনি' ও 'ছয় আনি' দুটি ভাগে বিভক্ত করে। ষষ্ঠীদাস গোস্বামীর জ্যেষ্ঠপুত্র রামদেবের বংশধারা পরিচিত 'দশআনি' হিসেবে এবং কণিষ্ঠ পুত্র মহাদেবের বংশধারা পরিচিত ছয়আনি হিসেবে।

এই পর্বে সমগ্র বংশলতা মোট কুড়িটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। পূর্ব বর্ণনা (পৃঃ ১৪৩-১৪৪) থেকেই বোঝা যাবে মূল বিভাগ দুটি, দশ আনি ও ছয় আনি। এক নম্বর তালিকার পঞ্চম পুরুষ ষষ্ঠীদাসের দুই পুত্র রামদেব ও মহাদেব যথাক্রমে দশ আনি ও ছয় আনি বংশলতার প্রথম পুরুষ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এই তথ্য মনে রাখলে বংশলতা অনুধাবন করতে সহায়তা হবে।

বংশলতা : এক

বংশলতা : দুই

রামরাম গোস্বামী (দশ আনি)
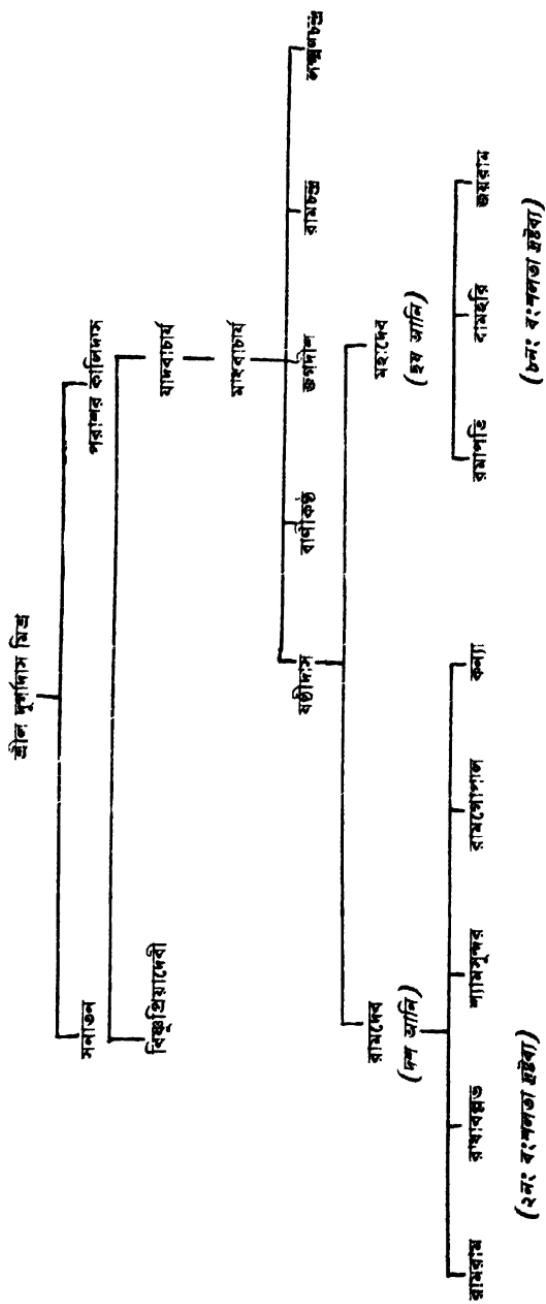
বংশলতা : দুই/ ক, খ, গ

২/ক বংশলতা

২-বংশলতার পরবর্তী অংশ

- বিজয়
  - দেবনারায়ণ
    - স্বপন
    - তাপস
    - নতুন
    - রমেশ
    - বুলবুল
  - জয়নারায়ণ
    - বিভাস
  - অনাদি
    - অমিত
  - আদিত্য
    - চন্দন

২/খ বংশলতা

২ বংশলতার পরবর্তী অংশ

- উপেন্দ্র
  - রমনী
    - রথীন্দ্র
    - রবীন্দ্র
    - রমেশ
    - রিতেন্দ্র
  - করুণা
  - সুধাময়

২/গ বংশলতা

২ বংশলতার পরবর্তী অংশ

- গোবিন্দ
  - নির্মল
  - বিমল
  - কমল
    - শ্যামল
    - উজ্জ্বল
  - অমল
  - ভূদেব
  - প্রকাশ
  - দীপক
    - ঋতুপর্ণ

বংশলতা : তিন

দশ আনি দ্বিতীয় পুত্রের শাখা

- শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ গোস্বামী
  - বলরাম
    - চৈতন্য
      - ক্ষুদিরাম (সন্ন্যাস)
      - গোলক (বংশ লোপ)
    - অদ্বৈত (বংশলোপ)
    - নিত্যানন্দ
      - বিষ্ণু (বংশ লোপ)
      - হরিশচন্দ্র
        - কাশীশ্বর
        - প্রসন্ন
          - বেনোয়ারী লাল
            - কৃষ্ণকিশোর
              - তপন
                - লোকনাথ
              - তাপস
              - তরুণ
          - কুঞ্জলাল
            - গৌরকিশোর
              - চন্দ্রকিশোর
                - অনির্বাণ
            - রাধাকিশোর
              - মলয়
              - ভোলা
            - জগৎকিশোর
              - জগন্নাথ
    - রামকৃষ্ণ
      - রাধারমন
      - রামরতন
      - মধুসূদন
      - (৩/ক তালিকা দ্রষ্টব্য)

বংশলতা : ৩/ক

দশ আনি দ্বিতীয় পুত্রের শাখা

বংশলতা : ৩/ক ১,২

৩/ক/১

কিশোরীলাল
রোহিনী
রামচন্দ্র
গোপাল
বলাই
নারায়ণ
সুদীপ্ত
প্রদীপ্ত
মনীন্দ্র
বিভাস
ললিত
কল্যাণ
নন্দ
গৌরাঙ্গ
গৌর
গোবিন্দ
গিরিধারী
প্রণব
কন্যা

৩/ক/২

ষষ্ঠীদাস
কামিনী
গঙ্গা
ত্রিগুণা
দেবাশিষ
শুভাশিস
গৌর
সদানন্দ
রামানন্দ
দেবানন্দ
দিলীপ

বংশলতা : চার

[তিন নং বংশলতার রামবতনেব (রামকৃষ্ণেব ২য় পুত্রেব) বংশলতা]

বংশলতা : ৪/ক

যতীন্দ্র
চিন্তামণি
বৈকুণ্ঠ
আনন্দ
রাসবিহারী
শিবপ্রদাস
শঙ্করপ্রদাস
অমরনাথ
অবিজিৎ
অসীম
অশোক
বিজয়
প্রাণকিশোর
অজয়
রামকিশোর
প্রেমকিশোর

বংশলতা : পাঁচ

[তিন নং বংশলতার মধুসূদনের (রামকৃষ্ণের কনিষ্ঠপুত্রের) বংশলতা]

বংশলতা : ছয়

দশ আনি ৩য় পুত্র

বংশলতা : ছয়/ক

চণ্ডীচরণ
শচীনন্দন
মুরারীমোহন
(নিঃসন্তান)
মনোমোহন
গৌরসুন্দর
নদীয়াবিনোদ
দক্ষিণা
বিষ্ণু
নাটুয়া
রসরাজ
গোবাচাদ
কৃপাময়
দীপাময়
স্নেহময়
দেবাশীষ
শুকদেব
কন্যা
শুভাশিস
স্নেহাশীষ
সৌম্য
সৌরভ
কন্যা
দুর্জয়
মৃত্যুঞ্জয়

বংশলতা : সাত

দশ আনি শাখা

- রামদেব
  - রামগোপাল (৪র্থ)
    - গোপীমোহন
      - কৃষ্ণচন্দ্র *(বংশলোপ)*
  - কন্যা (স্বামী রামনারায়ণ)
    - রামকান্ত
      - শিবপ্রদাস
        - নীলকমল
          - নবীন
            - নিত্যগোপাল
              - পঞ্চানন
                - বিমলেন্দু
                - শ্যামলেন্দু
                - অমলেন্দু
                - খোকা
              - জগবন্ধু
                - অনাথ
                - সাধন
            - শ্রীগোপাল
              - নবদ্বীপ
                - নীরদ
                - হাবুল
                - মুকুল
                - খোকন
            - শ্রীনাথ (সন্ন্যাসী)
          - নবকিশোর
            - যজ্ঞেশ্বর
              - গোলক
                - আলোক
                  - কন্যা
            - প্রসন্ন
              - রাম
                - ৩ কন্যা
              - রণজিৎ
          - কৃষ্ণচন্দ্র
            - শ্রীমাধব
              - রেবতী
              - গোরা
                - শ্যাম
                  - পরমানন্দ
                    - রামজ্যোতি
                    - রামাশিস
                  - দিলীপ
                    - রামকৃষ্ণ
                    - বামদেব
                  - সুভাষ
                    - ২ কন্যা
                  - সমর
                    - রশ্মাংশু
                    - রামার্য
              - মুরারি
              - মুকুন্দ
              - অন্নদা
                - কন্যা (স্বামী কানাইলাল)
                  - স্বরূপ
            - মনোমোহন *(বংশলতা ৭/ক দ্রষ্টব্য)*
            - হরি

বংশলতা : সাত/ক

মনোমোহন
রাধারমণ
দেবশরণ
সনাতন
বিমলেন্দু
নিত্যানন্দ
জ্যোতি
ধ্রুব
আনন্দ
অনন্ত
মদন
গৌতম
সীমাচল
প্রদীপ
২ কন্যা
কন্যা
অরিন্দম
সনৎ
প্রণব
তপন
স্বপন
মণি
সচ্চিদানন্দ

বংশলতা : আট

ছয় আনি শাখা

বংশলতা : আট/ক, খ

৮/ক বংশলতা

৮ বংশলতার পরবর্তী অংশ

- গোপেন্দ্র
  - নলিনী
    - সন্তু
  - ইন্দু
    - কন্যা
  - অবনী
    - রতু
      - অসীম
        - অমিয়
        - ধীরেন
      - সুশীল
        - সুব্রত
      - সুধীর
        - সুদিন
        - সুবীর
      - সুকুমার
        - পাঁচু

৮/খ বংশলতা

৮ বংশলতার পরবর্তী অংশ

- রমানাথ
  - মনীন্দ্র
    - বিষ্ণু
      - সুবীর
      - সুজিত
    - দেবী
      - দেবাশীষ
  - সতীন্দ্র
    - প্রবীর
      - শান্তনু
      - অভিমন্যু
    - অমুজ
      - অতনু
    - অলোক
    - তুষার
  - রমেন্দ্র
    - অভয়
      - কন্যা
    - স্বপন
      - কন্যা
    - অকিঞ্চন
    - নিতাই
  - জিতেন্দ্র
    - সমীর
      - কন্যা
    - দিলীপ
      - সুমন
  - মৃত্যুঞ্জয়
    - মৃণাল
    - চঞ্চল
    - সনৎ
    - সুব্রত
    - দীপঙ্কর

মহাদেব গোস্বামীর ৩য় পুত্র জয়রাম-এর বংশলতা